মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)

দাস প্রথা ও ইসলাম

দাস প্রথা ও ইসলাম

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২১-০৯২৪৬৭

লেখকের কথা

দাস প্রথা মানবজাতির এক দূরপনেয় কলঙ্ক এবং এটি একটি প্রাচীনতম সামাজিক সমস্যা। যুগ যুগ ধরে মানুষ এর বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দাবাদ উচ্চারণ করে এলেও কোনো মতবাদ বা ধর্মমতই এই ঘৃণ্য কুপ্রথাকে উচ্ছেদ করতে পারেনি। কিন্তু ইসলাম এক অনুপম বৈজ্ঞানিক পন্থায় দাসপ্রথার মূলোৎপাটন করেছে। বর্তমান গ্রন্থে এই জটিল সমস্যাটি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নিরপুণভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচী পত্র

দাস প্রথা ও ইসলাম	৭
দাসপ্রথা কি ?	১০
দাসত্ব দুই প্রকার	১০
দাসপ্রথা চালু হওয়ার কারণ	১১
দাসপ্রথার ইতিহাস	১৩
কুরআন মজীদে গোলামীর উল্লেখ	১৬
ইসলাম দাসপ্রথা বন্ধ করেনি কেন ?	১৯
সংশোধনী প্রচেষ্টায় ইসলামের বিশেষ কর্মপন্থা	২৩
যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানো যেতে পারে	২৬
মানুষের স্বাধীনতা জন্মগত ও মৌলিক	২৭
শরীয়তের দৃষ্টিতে যুদ্ধ	২৮
ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ	৩১
দাস মুক্তির কার্যকর পন্থা	৩৪
গুনাহের কাফফারা হিসেবে দাস মুক্তি	৩৬
মুক্তি লাভের পর	৪০
ক্রীতদাসদের অধিকার	৪১
ইসলামে গোলামী গোলামদের জন্য রহমত	৪৬
দাসীদের সাথে যৌন মিলন	৪৯
উপসংহার	৫৩
ভনডিনবার্গ লিখেছেন	৫৪
ফালিবী লিখেছেন	৫৫

দাস প্রথা ও ইসলাম

بسم الله الرحمن الرحيم

দাস প্রথা ও ইসলাম

জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন : 'দাসপ্রথা কি ? ইসলাম দাসপ্রথা সমূলে ধ্বংস করবার কোনো রাস্তা দেখিয়েছে কি ? ইসলামের স্বর্ণযুগে তথা প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর ধরে ইসলামী শাসনামলে কিভাবে দাস বা গোলাম রাখা হতো ? কোন যুক্তির বলে ক্রীতদাসীর সাথে যৌনমিলন করা যেতো ? এই জাতীয় যৌনমিলন আর স্ত্রী ছাড়া বেগানা মেয়েলোকের সাথে যৌনমিলনে পার্থক্য কোথায় ? সউদী আরবের কোন বাদশাহ্‌র নাকি বহু বিবি ছিল অথবা নারী ভোগ করত ? বর্তমান বিশ্বে বা কোনো ইসলামী রাজ্যে কি দাসী রাখার ব্যবস্থা থাকতে পারে?'

জবাব ঃ

আপনার প্রশ্ন ইসলামী ইতিহাসের এক জটিল ও মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝিপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে এর জবাব খুব দীর্ঘ ও বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ। আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়নই যথেষ্ট হতে পারে। এ কারণে এখানে আমি বিষয়টি সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনা করতে চাই, যাতে এ সম্পর্কিত যাবতীয় দিক সুস্পষ্ট হয় উঠতে এবং এ প্রসঙ্গের সকল পুঞ্জীভূত সন্দেহ, সংশয় ও ভুল ধারণা চিরতরে দূরীভূত হতে পারে। আমি লক্ষ্য করেছি, বহু আধুনিক শিক্ষিত লোকের মনে এ কারণে ইসলাম সম্পর্কে এক সংশয়পূর্ণ জিজ্ঞাসা তীব্রভাবে বর্তমান রয়েছে। অনেক ঈমানদার লোকও কেবলমাত্র এ কারণে ইসলামের মানবতাবাদী আদর্শের প্রতি সন্দেহ-ভারাক্রান্ত হয়ে আছেন যে, ইসলাম দাসপ্রথার ন্যায় এক মারাত্মক মানবতা-বিরোধী ও মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী ব্যাপারকে কি করে সমর্থন করতে পারে ? আর যদি সমর্থনই করে, তা হলে ইসলাম আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান ও মানব কল্যাণকামী আদর্শ হতে পারে কিরূপে ?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দাসপ্রথা সম্পর্কে ভুল ধারণা এবং এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের ব্যাপক মিথ্যা প্রচারণাই এই জিজ্ঞাসার প্রধান কারণ। অবশ্য

মানবতার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি ও মানবতাবিরোধী ব্যবস্থার প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ-অনুভূতিও এর মূলে রয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইউরোপীয় মনীষীরা এ বিষয়টিকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আমাদের শিক্ষিত জন-মানসে যে সন্দেহের ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছে, তা-ই আজ সর্বত্র মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। এই মনীষীদের রচিত সাহিত্যে একে ইসলামের একটি দূরপনেয় কলংক ও মুসলিম জাতির একটি গুরুতর দোষ হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে জে. জে. পোল মূয়র ও খ্রিস্টান পাদ্রী টি. পি. হিউজ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জে. জে. পোল লিখেছেন ঃ

'ইসলামী রাজ্যসমূহে দাস তত নয়, যত আছে দাসী। "মুসলমানদের শহরে-নগরে যে দাসপ্রথার যথেষ্ট রেওয়াজ রয়েছে এর কারণ এই যে, কুরআনই এর অনুমতি দিয়েছে যে, যুদ্ধবন্দী মেয়েলোককে নিজেদের দাসী বানিয়ে রাখবে এবং তাদের সাথে যৌন সংগম করবে।" একজন বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক দাসী রাখার অনুমতি মুসলমানদের জন্য পাপের বন্যা প্রবাহেরই দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়নি বরং দাসদের গলায় এমন শৃংখল জড়িয়ে দিয়েছে যে, তা গোলামীর রেওয়াজকে ইসলামী রাজ্যসমূহে একটি পছন্দনীয় কাজ বানিয়ে দিয়েছে।' (স্টাডিজ ইন মুহাম্মাডেনিজম)।

ঐতিহাসিক মূয়র তাঁর Life of Mohammad (New edition P-347) নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'মুসলমান মনিবদের প্রতাপ ও আধিপত্যের অধীন দাসীদের জীবন সম্পর্কে বলা যায় যে, মানবতার অপমান ও লাঞ্ছনার এতদপেক্ষা ভয়াবহ ও বীভৎস রূপ আর কিছুই কল্পনা করা যেতে পারে না। দাসীদের সাথে মানব সমাজের এক ঘৃণ্য জীবের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। তারা বিবাহের যোগ্যা হলে তাদেরকে বিবাহের অধিকার হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয় এবং দাসরা হয় সম্পূর্ণরূপে মনিবের মুষ্টিবদ্ধ।'

মূয়র অন্য জায়গায় লিখেছেন ঃ

'নারীদের দাসত্ব তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতির জন্য এক জরুরি শর্ত। এজন্য মুসলমানগণ কখনো আন্তরিকতা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ বিষয়টিকে নির্মূল করতে চেষ্টা করবে না।'

টি. পি. হিউজ বলেছেন ঃ

'দাসপ্রথার শিক্ষা ইসলামের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মে দাসত্বের প্রতি রয়েছে তীব্র ঘৃণা। মুহাম্মাদ (স) আরব জাহিলিয়াতের দাসপ্রথায় কিছুটা সংশোধন এনেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, আরবের এই শরীয়ত প্রদাতার ইচ্ছা ছিল দাসপ্রথাকে স্থায়ীভাবে কায়েম রাখা। (Note on Mohammadanism, 2nd edition, p-195)

খ্রিস্টান লেখকগণ বড় নির্ভীক এবং নির্লজ্জভাবে বলে বেড়ায় যে, দাসপ্রথা চালু থাকার কারণে মুসলমানরা দেশ-বিদেশের সুন্দরী, রূপসী ও যুবতী মেয়েদের সম্ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিল। এই কারণে তারা সব সময় দাসপ্রথাকে চালু রেখেছে এবং কেবল চালু রেখেই ক্ষান্ত হয়নি, খুব জোরালোভাবে এর সমর্থন ও উন্নতি সাধন করেছে।

পোল মূয়র আরো লিখেছেন ঃ

যেসব কারণে মুসলমানরা দাসপ্রথাকে চালু রাখতে বাধ্য হয়েছে, তা যে কতদূর শক্তিশালী তা আমরা এখন ধারণা করতে পারি। একে খতম করার অর্থ অনেকটা এই হতে পারে যে, এর ফলে মুসলমানদের যে হেরেম সজ্জিত করার প্রথা দৃঢ়মূল হয়েছিল তা-ই খতম করে দেয়া হবে।

পরে তিনি এও লিখেছেন ঃ

দীর্ঘকাল যাবত মুসলমানরা যুদ্ধের মাধ্যমে দাস লাভ করছিল। প্রত্যেক যুদ্ধবন্দীকেই দাস বানানো হতো। বিজয়ীর এখতিয়ার ছিল, হয় সে বিনিময় মূল্য গ্রহণ করবে কিংবা তা ছাড়াই যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করে দেবে। কিন্তু যেসব স্ত্রীলোক বন্দী হতো, সাধারণত তাদের অনুকূলে বিনিময় মূল্য গ্রহণ করা হতো না, বরং বিলাস-বাসন ও হেরেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক করে রাখা হতো।

এসব উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দাসপ্রথাকে ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ কিভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন এবং এসব বই-পুস্তক পাঠ করলে ও অপরদিকে সঠিক ব্যাপার সম্পর্কে জানবার কোনো ব্যবস্থা এবং উপায় না থাকলে শিক্ষিত লোকদের মন যে খারাপ হয়ে যাবে— ইসলামের প্রতি সন্দিহান ও বিদ্বেষী হয়ে উঠবে, তা আর বিচিত্র কি।

দাসপ্রথা কি ?

'ধর্ম ও নৈতিকতার বিশ্বকোষ'-এ দাসপ্রথার সংজ্ঞা প্রদান করে লেখা হয়েছেঃ

'এটি একটি সামাজিক রেওয়াজ, এর দরুন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়। The World Wide Encyclopedia-এ লেখা হয়েছে : Slavery, The status of one who is the property of another, Vo. 8 —'একজনের মালিকানার অধীন অপরজনের মর্যাদাকেই বলা হয় দাসত্ব।'

ওয়েস্টার মার্ক (Wester mark) দাসত্বের সংজ্ঞায় বলেন ঃ

গোলামের মালিকানায় মালিকের অধিকার যদিও অনিবার্য ও নিরংকুশ নয়, তবুও এ একটি বিশেষ রকম। অন্য কথায়, এই মালিকানা-অধিকার এমন একটি অধিকার যে, কেবলমাত্র মনিবই এ থেকে হাত তুলে নিতে পারে, পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু একে নিরংকুশ মালিকানা বলা যায় না। কেননা আইন ও জন-প্রচলন গোলামকেও এক রকমের অধিকার দান করেছে।

দাসত্ব দুই প্রকার

নীতিগতভাবে দাসত্ব দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমটি, এক গোত্রের কিছু লোক সেই গোত্রেরই কিছু লোককে নিজের গোলাম বানিয়ে নেয়। আর দ্বিতীয়টি, এক গোত্রের কিছু লোক অপর এক গোত্রের কিছু বা সমস্ত লোককেই নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়। প্রথম প্রকারকে ইংরেজীতে বলা হয় Intra-tribal slavery, এবং দ্বিতীয় প্রকারকে বলা হয় Extra-tribal slavery।

মানবেতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে লোকদের মধ্যে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের গভীর অনুভূতি ছিল এবং পরস্পরের প্রতি ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ। এ জন্য প্রথম প্রকারের গোলামী সম্ভবত ইতিহাসের সেই প্রাথমিক পর্যায়ে বর্তমান ছিল না। আর দ্বিতীয় প্রকারের গোলামী তো যুদ্ধের অপরিহার্য অংশ। একটি জাতি অপর কোনো জাতি বা গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে প্রত্যেকটি পক্ষেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা হয় বিরুদ্ধ পক্ষকে সর্বোতভাবে পর্যুদস্ত ও নির্মূল করে দেয়া। বস্তুত শান্তির সময় যে মানুষ ফেরেশতার অপেক্ষাও অধিক মানবতাবাদী ও শান্তিকামী, যুদ্ধের সময়ই সে হয় ভয়াবহ, প্রতিহিংসা পরায়ন ও জিঘাংসু। এ কারণে সে ব্যাপক নরহত্যায় মেতে ওঠে এবং নির্বিচারে ও বিনা হিসেবে নরহত্যার অভিযান

চালিয়ে সে তার উদগ্র রক্ত পিপাসাকে চরিতার্থ করে। শত্রুর ঘর সম্মুখে এলে সে তাতে অগ্নিসংযোগ করে, ধন-সম্পদ পাওয়া গেলে সে তা লুণ্ঠন করে নেয়। পুরুষ ও শিশু পাওয়া গেলে সে তাদেরকে বন্দী করে ও গোলাম বানায়, আর স্ত্রীলোক হস্তগত হলে সে তাকে নিজের দাসী বানিয়ে রেখে দেয়।

মোট কথা, দ্বিতীয় প্রকারের গোলামী যুদ্ধের অনিবার্য ফসল। এ কারণে একথা বলা সম্পূর্ণ সত্য যে, দুনিয়ায় যতদিন যুদ্ধ আছে, এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে গোলামী আর দাসত্বও ততদিন চালু থাকবে। নৈতিক দৃষ্টিতে পুরাকালের লোকদের ধারণা ছিল যে, বিজয়ী ব্যক্তি বা দলের জয়ী হওয়াই প্রমাণ করে যে, সেই সত্যপন্থী— সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর বিজিত ব্যক্তি বা দলের বিজিত হওয়াই প্রমাণ করে যে, সে সত্যপন্থী নয়। এই কারণে বিজয়ী দল বা ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছা স্বীয় আরাম-আয়েশের জন্য বিজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ব্যবহার করার অধিকারী ন্যায়সঙ্গতভাবেই। সে ইচ্ছা করলে বিজিতকে হত্যা করতে পারে, ইচ্ছা করলে আটক করে রাখতে পারে, তাকে মারতে পারে, গোলাম বানাতে পারে, কোনো জিনিসের বিনিময়ে অদল-বদল করতে পারে, আর চাইলে মুক্ত করেও দিতে পারে। (Encyclopedia of religion and ethics)

দাসপ্রথা চালু হওয়ার কারণ

কিন্তু দাসপ্রথা প্রচলনের মুলীভূত কারণ কি ? একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে। মিঃ এ. এন. গুলবার্টসন লিখেছেন যে, উত্তর আমেরিকাস্থ ভারতীয়দের মধ্যে একটা রেওয়াজ ছিল, যাকে Adoption (এডপশান) বলা যায়। এই প্রচলনের দৃষ্টিতে যুদ্ধ শেষে বিজিত পক্ষের পুরুষকে হত্যা করা এবং শিশু ও নারীদেরকে জীবিত রেখে নিজেদের ঘরে রেখে দেয়া হতো। এই লেখকই বলেছেন যে, দাসপ্রথা এই প্রথারই একটি উন্নত রূপ, যাতে শিশু ও নারীদের ন্যায় পুরুষদেরও জীবিত থাকতে দেয়া হয় এবং তাদেরকে গোলাম বানানো হয়। এর মনস্তাত্বিক কারণের দিকে ইঙ্গিত করে Nloboer সুন্দর কথা বলেছেন ঃ

'পশুপালন মানুষের একটি স্বভাব। এই স্বভাবই ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে মানুষকে পালবার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং একেই বলা হয় গোলামী বা দাসপ্রথা।' (Encyclopedia of religion and ethics)

আমরা মনে করতে পারি যে, প্রথম দিক দিয়ে যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো নাম-নিশানা ছিল না এবং সাধারণ মানুষ পাশবিকতা ও বর্বরতার

নিম্নস্তরে জীবন যাপন করত, তখন বিজয়ী দল বন্দীদেরকে অদমনীয় ক্রোধ ও আক্রোশের বশবর্তী হয়ে হত্যা করেই শেষ করত। উত্তরকালে যখন লোকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন প্রচণ্ড ও ব্যাপকরূপ লাভ করল এবং মজুরিবিহীন মজুরের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তারা চিন্তা করে ঠিক করল যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে বাঁচিয়ে রাখলে তাদের দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণের অনেক কাজই সম্পন্ন করা যায়। দ্বিতীয়ত, বিজয়ীদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর প্রভাবে বিজিতদেরও একটি উন্নত সমাজে পরিণত করা যেতে পারে কিংবা বিজিত জাতির কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বিকাশের সুযোগ দিয়ে মানব সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা যেতে পারে। অন্য কথায় এই চিন্তাও গোলাম বানাবার রেওয়াজ চালু হওয়ার সহায়তা করেছে যে, বন্দীদের হত্যা করার পরিবর্তে জীবিত রেখে কাজে বিনিয়োগ করা।

দাসপ্রথার সামাজিক সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় বহু ইউরোপীয় মনীষীর লেখায়। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেছেন ঃ

'একথা খুবই সমর্থনযোগ্য যে, এক পক্ষ যখন আধিপত্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিরুদ্ধ পক্ষকে হজম করার পরিবর্তে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়, তখন তাদেরকে জীবিত রাখাই উন্নতির দিকে এক পদক্ষেপ। দাসপ্রথা যতই খারাব হোক না কেন, তা সত্ত্বেও এটা আপেক্ষিকভাবে ভালো। আর কোনো কোনো সময় সাময়িকভাবে এটাই হয় একমাত্র কর্মোপযোগী পথ ও পন্থা।' (Study of sociology)

লর্ড একটিন বলেছেন ঃ

'অনেক সময় অবস্থা এমন হয়, যখন সেই অবস্থাদৃষ্টে একথা বলা মোটেই অসমীচীন হয় না যে, গোলামীই মূলত আজাদী মঞ্জিলের এক পর্যায়।' (Slavery in the Roman Empire. p-15)

এ প্রসঙ্গে মিঃ আর. এইচ. বারোর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'রোমান সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা' শীর্ষ মূল্যবান গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

'গোলামী এমন একটি শব্দ যা শুনতেই কানে খারাপ লাগে। এই শব্দ কানে প্রবেশ করা মাত্রই লৌহশৃংখলের ঝংকার, চাবুকের শপাং শপাং ধ্বনি এবং মজলুম গোলামদের মর্মবিদারী চিৎকার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হতে শুরু করে। গোলামীকে সাধারণত খারাপভাবে দেখা হয়। কিন্তু গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা

করলে একথায় কোনো সন্দেহ থাকে না যে, গোলাম খুব বেশি কিছু মহান আর পবিত্র না হলেও সভ্যতার অগ্রতি ও উৎকর্ষ সাধনে তাদেরও যথেষ্ট অংশ রয়েছে। তবুও গোলামীর রেওয়াজ বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু পুরাকালের দাসপ্রথাকে সর্বোতভাবে খারাপ বলা এবং এটাকে চূড়ান্ত ঘৃণার্হ মনে করা আমাদের উচিত নয়।'

নৈতিকতার দৃষ্টিতে বিচার করলে গোলামী প্রথার ভালো কিংবা মন্দ হওয়া নির্ভর করে যারা গোলাম বানায় তাদের চরিত্রের ভালো বা মন্দ হওয়ার ওপর। তাদের নৈতিক মান উচ্চ হলে গোলাম তাদের নিকট খুবই সুখী ও সন্তুষ্ট থাকবে, তাদের সংস্পর্শে এসে তারাও ভালো হবে।

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর গ্রন্থ The Principal of Sociology -তে একস্থানে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন ঃ 'দাসপ্রথা ব্যতীত রাষ্ট্রনীতি পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে না।'

দাসপ্রথার ইতিহাস

ইতিহাস অধ্যয়নে একথা স্পষ্ট জানতে পারা যায় যে, দাসপ্রথা প্রাচীনকালের সকল উন্নত ও সুসভ্য জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আর ধর্মের ইতিহাসে হিন্দু, খ্রিস্টান ও ইহুদী— এ তিনটিরই ধর্মগ্রন্থে গোলামী প্রথার বিরুদ্ধে কোথাও কিছু বলা হয়নি। The world wide encyclopedia গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ Slavery has oxisted from the Earliest times in verying degres —'প্রথম যুগ হতেই দাসপ্রথা বিভিন্ন রূপে ও মাত্রায় চালু হয়ে এসেছে।' (Vo-8)

Mr. L. D, Agate লিখেছেন ঃ

'হযরত মসীহ ঈসার প্রদত্ত শিক্ষায় দাসপ্রথার প্রতিবাদ কোথাও পাওয়া যায় না। দাসপ্রথার আজিকার বিরোধীরা নিজেদের সমর্থনে ইঞ্জিলের একটি বাক্যও যে পেশ করতে পারবে না, তা নিঃসন্দেহ।'

সকল খ্রিস্টান মনীষীই অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ক্রীতদাস বানানোর নিয়ম তাদের ধর্মসম্মত এবং ধর্মীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই-ই নয়, ধর্মতত্ত্বের পারদর্শী পণ্ডিতরা এটাকে খোদায়ী নির্দেশ মনে করতেন এবং একটি কল্যাণকর ব্যবস্থারূপে দৃঢ়ভাবে গণ্য করতেন। Encyclopedia of Religion and ethics) গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটলে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এই গোলামী ব্যবস্থা দেয়ার স্থায়ী ও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, এরিস্টটল মনে করতেন, গ্রীকদের বাদ দিয়ে অন্য সব মানুষকেই দাস বানাবার (enslaved) যোগ্য।

Philman (ফিলম্যান)-এর নামে সেন্টপল প্রদত্ত এক বাণীতে তার পলাতক গোলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'তার উচিত তার মনিবের কাছে ফিরে যাওয়া।' মূল দাসপ্রথার প্রতিবাদ সেন্ট পলও কোথাও করেননি। (Encyclopedia of religion and ethics)

শুধু তাই-ই নয়, গোলাম আর দাসদের সম্পর্কে খ্রিস্টান ধর্মে অত্যন্ত ঘৃণা পোষণা করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট সিরিল (cyril) গোলাম ও মনিবের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টিরূপে। এ থেকে দাস সম্পর্কে তাদের মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। (Encyclopedia of religion and ethics)

ইঞ্জিলে গোলামদের স্বাধীন করার কথা কিংবা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ কোথাও নেই। অধিকন্ত বিভিন্ন জায়গায় গোলামদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের মনিবদের আনুগত্য করতে এবং নিষেধ করা হয়েছে মনিবদের কথার বিন্দুমাত্র অমান্য করতে।

ইহুদী ধর্মেও গোলাম বানাবার অনুমতি রয়েছে। ইহুদী শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন ইবরানী অপর ইবরানীকে যে-কোনো ভাবে হোক গোলাম বানাতে পারে। ইহুদীরা গোলামের ব্যবসাও করত।

সংস্কৃত ভাষার সমস্ত ধর্মগ্রন্থে দাসপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মোটামুটি এ প্রথাকে সমর্থন করা হয়েছে। মনুর গ্রন্থে গোলাম বানাবার সাতটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন পারসিকরা বিপুল সংখ্যক গোলাম থাকাকে ধন-ঐশ্বর্যের নিদর্শন বলে মনে করত। প্রাচীন চীন দেশের লোকেরাও গোলামদের সাথে যে-কোনো রূপ ব্যবহার করার তাদের দেশীয় ও ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী অধিকার ছিল।

প্রাচীন গ্রীক সমাজে এটি ভিত্তি ও সভ্যতার উৎকৃষ্টের বাহন হিসেবে চালু ছিল। World wide Encyclopedia-তে slavery পর্যায়ে লেখা হয়েছে : It was the basis on which the ancient greece built up their civilization. অর্থাৎ 'প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার জন্য দাসপ্রথা ছিল ভিত্তি এবং এরই ওপর গ্রীক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।'

প্রাচীন গ্রীক সমাজে দুটি কারণে গোলামী চালু হয়েছিল ঃ একটি যুদ্ধ আর অপরটি প্রয়োজন। The world wide Encyclopedia গ্রন্থের মতে যুদ্ধবন্দী কিংবা অপহৃত (Victimes of kidnapars) ব্যক্তিরা দাস হয়ে থাকত। গ্রীক

সমাজে দাসদের ঔরসজাত সন্তানও দাস হিসেবে বিক্রি হতো এবং শিশু সন্তানও দাসদের মধ্যেই গণ্য হতো। (Encyclo pedia of religion and ethics voll. 8)

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় গোলামদের কেবলমাত্র খেদমত ও ভৃত্যের কাজে ব্যবহার করা হতো।

রোমান সভ্যতায় দাসপ্রথা একটি বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব লাভ করেছিল। প্রাচীনতমকালের এই বিখ্যাত সভ্যতায় গোলামদের কোনো মানবীয় মৌলিক অধিকার ছিল না। মনিবদেরই ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তাদেরকে জীবিত রাখা হবে কি হত্যা করা হবে, তা ছিল মনিবদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। তাদের কোনো কাজে দোষ ধরার অধিকার কারো ছিল না। The World wide Encyclopedia গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ The lot of the early Rome, an slaves was much harder. By law a master was vested with the power of life and death over his slaves, he could separate a married couple, and their property was legally his. (voll. 8)

প্রাচীন রাশিয়ার গ্রামীণ জনতা তিনভাগে বিভক্ত ছিল। গোলাম, স্বাধীন কৃষি-মজুর ও কিষাণ। অষ্টাদশ শতকে এই তিন শ্রেণীর গোলামদের একটি সংস্থা বানানো হয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিসমূহে দাসপ্রথা বিগত শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। যদিও পরে সর্বসম্মতিক্রমে তা বাতিল করা হয়। কিন্তু এই প্রথা যতদিন ছিল ততদিন পর্যন্ত এসব দেশে গোলামদের সাথে অমানুষিক ও নির্মম ব্যবহার করা হয়েছে। 'ধর্ম ও নৈতিকতার বিশ্বকোষ'-এ লেখা হয়েছে ঃ ১৪৪২ সালে গাঞ্জালেস (Ganzales) পর্তুগালের প্রিন্স হেনরীকে দশটি গোলাম উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিল। এ সময় আফ্রিকার অধিবাসীদেরকেই বেশিরভাগ গোলাম বানানো হতো। এ জন্য ইউরোপীয়রা তাদের ওপর হামলা করার নানা কৌশল রচনা করত। "স্যার জন হকিংগওনীয়া রওনা হয়ে গেলেন এবং তিনশত গোলাম ধরে তাদের বিক্রয় করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।" এসব ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইউরোপীয় জাতিসমূহের ইতিহাস গোলামী প্রথা ও গোলামদের সাথে অমানুষিক ব্যবহার, অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন এবং গোলাম বিক্রির ব্যবসা করার কাহিনীতে ভরপুর রয়েছে।

কুরআন মজীদে গোলামীর উল্লেখ

গোলামীর এই দীর্ঘ ইতিহাস হতে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, গোলামী প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন এবং এর পশ্চাতে কেবল সামাজিকই নয়, অর্থনৈতিক কারণও প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পারি, কুরআন মজীদে গোলামীর উল্লেখ কিভাবে করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে কি নির্দেশ ও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে গোলাম বানাবার কোনো অনুমতি আছে কি নেই, এ প্রশ্নের জবাবে আমরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করতে পারি যে, কুরআনে গোলাম বানাবার আদেশ কোথাও নেই। গোলামের উল্লেখ কুরআন মজীদের নানা জায়গায়, নানা প্রসঙ্গে ও নানাভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাধীন মানুষকে গোলাম বানাবার কথা কোথাও পাওয়া যাবে না।

গোলাম বানাবার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধ সম্পর্কে বেশির ভাগ আলোচনা সূরা 'আল আনফাল'-এ করা হয়েছে। এই সূরার একস্থানে প্রসঙ্গত বলা হয়েছে ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ۞

নিজের কাছে বন্দীদের রেখে দেয়া কোনো নবীরই উচিত নয়, যতক্ষণ না খুব বেশি করে রক্তপাত করা হবে। (সূরা আল-ফাল ঃ ৬৭)

বদর যুদ্ধের সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক। এই যুদ্ধে যেসব কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, তাদের সম্পর্কে কি করা যায় এ নিয়ে রাসূলে করীম (স) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো কোনো বন্দীকে বিনিময় মূল্য নিয়ে এবং কোনো কোনো বন্দীকে বিনিময় মূল্য ছাড়াই মুক্ত করে দেন।[১] রাসূলের দয়াদ্র হৃদয়ের দৃষ্টিতেই এই নীতি অবলম্বন করা হলেও সাধারণ দেশীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির দৃষ্টিতে তা সমীচীন ছিল না। এই কারণে উপরোক্ত আয়াতে এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।[২]

১. تفسير محاس لناومن ج ٨ ص ٤٠ ٣٠ سيرة ابن حشام

২. কতিপয় বিশেষজ্ঞ মনে করেন, উক্ত আয়াতটি এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র অনুমতি পাওয়ার পূর্বেই গণীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হওয়া প্রসঙ্গে। তিরমিযী, কিতাবুল খারাজ ও তাফসীরে তাবারীতে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ বদর যুদ্ধের দিন অনুমতি লাভের পূর্বেই মুসলমানরা গণীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হওয়ায় এই আয়াতে এর সমালোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াত থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, চূড়ান্ত জয়লাভ হওয়ার আগে বিনিময় মূল্য নিয়ে কিংবা এটা ব্যতীতই যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেয়ার ঝামেলায় পড়া মুসলিম মুজাহিদদের উচিত নয়; বরং যুদ্ধ, হত্যা ও কাফের নিধনের কাজ অব্যাহত রাখাই মুসলমানদের কর্তব্য। যুদ্ধে মুসলমানদের চূড়ান্ত জয় হলে তখন তাদের কোন নীতি অবলম্বন করা উচিত, সে সম্পর্কে এ আয়াত কিছুই বলে না।

এই সূরাতেই একটু পরে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ ۞

হে নবী, আপনার হাতে যেসব বন্দী রয়েছে, তাদেরকে বলুন যে, আল্লাহ যদি তোমাদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পান তবে তোমাদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে, তদপেক্ষাও ভালো তোমাদের দান করবেন। (আনফাল ঃ ৭০)

এ আয়াতও বদর যুদ্ধ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। এ থেকেও জানা যায় যে, যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কি নীতি অবলম্বন করা উচিত, তা এখানেও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অবশ্য সূরা মুহাম্মাদ-এর নিম্নোক্ত আয়াতে এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়।

বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّا ۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۞

তোমরা যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন তাদেরকে হত্যা করো। যখন খুব ব্যাপকভাবে হত্যাকার্য সম্পন্ন করে নেবে, তখন তাদেরকে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখো। অতপর হয় অনুগ্রহ করবে, কিংবা বিনিময় গ্রহণ করবে— যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্রসংবরণ করবে।

বাহ্যত এ আয়াত হতে বোঝা যায় যে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে কেবলমাত্র দুই ধরনের নীতিই অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ হয় তাদেরকে বিনিময় মূল্য নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হবে, নয় তা ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হবে।

কিন্তু সূরা 'মুহাম্মাদ' ও সূরা 'আল-আনফাল'-এ সুস্পষ্ট ভাষায় ও ইশারা-ইঙ্গিতে যা বলা হয়েছে এবং সেই সাথে স্বয়ং নবী করীম (স) ও তাঁর পরে সাহাবায়ে কেরাম যে নীতি অনুসরণ করেছেন, তা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে

স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, এই আয়াত রাষ্ট্রপ্রধানকে অবস্থা ও স্থান বিশেষে যুদ্ধবন্দীদের সাথে যে কোনো ব্যবহার করার এখতিয়ার দান করে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী একটি ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

فكان فى ذلك تقوية لقول الجمهور ان الامر فى اسرى الكفرة من الرجال الى الامام يفعل ماهو الاحظ للاسلام والمسلمين - (فتح البارى ج ٦ ص ١١٤)

উক্ত ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় যে, কাফের পুরুষ যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থানুকূলে যে কোনো নীতি অবলম্বন করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের রয়েছে, অধিকাংশ মনীষীর এই কথাই সত্য ও অকাট্য।

সুরায় 'আল-আনফাল'-এর পূর্বোক্ত আয়াতের তাফসীরে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে নবী করীম (স)-এর অনুসৃত বিভিন্ন কর্মনীতির উল্লেখ করার পর আল-আসকালানী লিখেছেন ঃ

فدل كل ذلك على ترجيح قول لجمهور ان ذلك راجع الى راى الامام ومحصل أحوالهم تخير الامام بعد الاسر بين ضرب الجزية لمن شرع اخذها منه او القتل اولاسترقاق اوالمن بلا عوض اوبعوض (ايضاص ١١٥)

এসব কিছু হতে অধিকাংশ মনীষীদের কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধবন্দীদের বেলায় যে কোনো নীতি গ্রহণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ারাধীন। অর্থাৎ বন্দী করার পর রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ার রয়েছে যে, বন্দীদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য করবে— যার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত, অথবা তাদেরকে হত্যা করবে, কিংবা গোলাম বানিয়ে নেবে, অথবা বিনিময় মূল্য নিয়ে বা না নিয়ে তাদের জান-প্রাণ ভিক্ষাদান করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও মু'মিন মুসলমানদেরকে এখতিয়ার দান করেছেন, হয় বন্দীদেরকে হত্যা করবে, নয় গোলাম বানিয়ে রাখবে। আর ভালো মনে করলে বিনিময় মূল্য নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবে। (فتح البارى ج ٩ ص ٥)

بدائع الصنائع গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে :

واما الرقاب فلامام فيها بين خيارات ثلاث

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধানের তিন প্রকারের মধ্যে যে কোনো প্রকারের নীতি অবলম্বন করার এখতিয়ার রয়েছে।

এই পর্যায়ে চূড়ান্ত কথা এই যে, ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের গোলাম বানাবার কেবল অনুমতিই দিয়েছে মাত্র, নির্দেশ কোথাও দেয়নি। সময় ও অবস্থাগতিকে এবং কোনো কোনো অনিবার্য কারণে গোলাম বানানোকে যদিও 'মুবাহ্' করা হয়েছে, কিন্তু এটাকে কখনো ভালো দৃষ্টিতে দেখা হয়নি, পছন্দ করা হয়নি। আর যেহেতু গোলাম বানানোর প্রশ্ন সাময়িকভাবে দেখা দিয়ে থাকে, তা সমষ্টিগত জীবন ও তমদ্দুনের কোনো স্থায়ী অংশ নয়। ঠিক এই কারণেই কুরআন মজীদে গোলাম বানানোর উল্লেখ কোথাও নেই। নরহত্যা হচ্ছে সকল দণ্ডের মধ্যে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ দণ্ড, কুরআনের কয়েক স্থানেই তার নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু গোলাম বানানোর নির্দেশ একেবারেই নেই— না স্পষ্ট ভাষায়, না ইশারা ইঙ্গিতে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গোলাম বানানো কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই, এমন কথা বলা যায় না। একদিকে কুরআনের আয়াতে গোলাম বানানো সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো কথাই নেই। অন্যদিকে নবী করীম (স) কোনো যুদ্ধবন্দীকে গোলাম বানিয়েছেন এবং তদানীন্তন সাধারণ দেশীয় ও সামাজিক অবস্থার ঐকান্তিক দাবিও ছিল যে, গোলাম বানানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়। এই কারণে একথা বলা যেতে পারে না যে, ইসলামে কোনো অবস্থাতেই গোলাম বানানোর অনুমতি নেই বা গেলাম বানানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

ইসলাম দাসপ্রথা বন্ধ করেনি কেন ?

ইসলাম দাসপ্রথায় সম্ভাব্য মৌলিক ধরনের সংশোধন প্রয়োগ করেছে এবং গোলামদেরকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে সাধারণ মানুষের সারিতে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম এই কুপ্রথা— এই মানবতা বিরোধী ও মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী প্রথার চূড়ান্ত অবসান ঘটায়নি কেন তা একটি প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা। এর জবাব চিন্তা করলে আমরা নিম্ন লিখিত কারণগুলো দেখতে পাই ঃ

এক. ইসলাম যখন দুনিয়ায় শেষবারের মত হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রচারিত ও উপস্থাপিত হয়, তখন শতাব্দীকালের দাসপ্রথা দুনিয়ায় প্রচলিত ছিল। লোকদেরকে গোলাম বানানো হতো ও গোলাম রাখা হতো। আরব দেশের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আরববাসী বিপুল সংখ্যক গোলাম ও দাসী রাখত এবং তা নিয়ে গৌরব করত। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যুদ্ধবন্দীদেরকে ধরে দাস বানানোর উদ্দেশ্যেও বড় বড় যুদ্ধ ও সংগ্রাম হতো।

দুই. এই যুগের অর্থনৈতিক অবস্থাও গোলামী প্রথা চালু রাখারই অনুকূল ও স্বপক্ষে ছিল। একদেশ হতে দেশান্তরে যাতায়াতের ব্যবস্থা ও যানবাহন কিছুমাত্র যথেষ্ট ছিল না। আরব দেশ মোটেই কৃষিনির্ভর দেশ ছিল না। বিপুল সংখ্যক কৃষক ও মজুরের খাদ্যের ব্যবস্থাও সহজে সম্পন্ন হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। শিল্পের দিক দিয়েও এই দেশ ছিল একেবারে পশ্চাৎপদ। ক্ষুদ্র শিল্পেরও কোনো অবকাশ বা কোনো প্রসার ছিল না। ফলে অসংখ্য গরীব লোকদেরকে কর্মে বিনিয়োগ ও তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করার কোনো উপায় কার্যকরী ছিল না। এরূপ অবস্থায় সমাজের নিয়ম-শৃংখলা অক্ষত ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য একান্তই প্রয়োজন ছিল যে, সম্পদশালী লোকেরা গরীব লোকদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে গ্রহণ করবে। একালে অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে পড়ে অনেক মা-বাবা নিজেদের সন্তানদেরকে ধনীদের কাছে বিক্রি করে দিত আর এই সন্তান ক্রয়কারী লোকেরা তাদেরকে গোলাম ও দাসী বানিয়ে নিত। এসব কারণে সমাজ দর্শনের বিশেষজ্ঞগণ একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, মানব সমাজে এমন অবস্থা কখনো কখনো অনিবার্যরূপে দেখা দেয় যখন দাসপ্রথার প্রচলন ক্ষতিকর হওয়ার পরিবর্তে বরং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের অনুকূল বাহনে পরিণত হয়।

মোট কথা, ইসলামের অভ্যুদয়কালে আরব দেশে দাস-দাসী রাখার ব্যাপক ও সাধারণ প্রচলন বর্তমান ছিল এবং তা ছিল তদানীন্তন সমাজ সংস্থার অস্থি-মজ্জার সাথে গভীরভাবে প্রযুক্ত। এক্ষণে আরব সমাজের জীবন পদ্ধতি, সাধারণ সামাজিক নিয়ম-কানুন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সুস্পষ্ট ও মৌলিক বিপ্লব সাধিত না হওয়া পর্যন্ত এই বদ রসম চূড়ান্তভাবে হঠাৎ করে বন্ধ করা যেতে পারে না। যদি সহসা এবং কোনোরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই এই কাজ করা হতো, তাহলে আরববাসীদের সর্বাত্মক ও বিরাট ক্ষতি সাধিত হতো। 'ধর্ম ও নৈতিকতার বিশ্বকোষ'-এর প্রবন্ধ রচয়িতা যুগ-যুগান্তকালের কোনো রসম হঠাৎ করে যে বন্ধ করা যায় না তার প্রমাণ হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকায় দাসপ্রথা হঠাৎ বন্ধ না করার কথা উল্লেখ করেছেন।

যুগান্তকালের দাসপ্রথাকে হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে এই দাস-দাসীদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হতে পারত তাও গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। কেননা দেখা গেছে যে, যে গোলামকে মুক্ত করা হলো, সে স্বাধীনভাবে রুজি-রোজগারের সন্ধানে বাহির হয়ে গেল। কিন্তু বহু চেষ্টা করে বহু ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সেই মনিবের কাছেই এসে বলল ঃ

'আমাকে আবার আপনার গোলাম বানিয়ে রাখুন।' আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে ও (মিসরীয়) সুদানে ঠিক তাই ঘটেছিল।

তদানীন্তন আরব সমাজের দাসপ্রথার চূড়ান্ত বিলোপ সাধনের প্রশ্নটি চিন্তা করে দেখা উচিত। ইসলামী হুকুমত সহসাই যদি দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে দিত, তাহলে সেই দাস-দাসীদের অবস্থাই বা কি হতো এবং তাদের মনিবদের যে বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হতো, তারই বা পরিপূরণের কি ব্যবস্থা হতো? তখন কি একদিকে মনিবদের ক্ষতিপূরণ দেয়া ও অপরদিকে বিপুল সংখ্যক দাস-দাসীর জীবিকার ব্যবস্থা করার কঠিন দায়িত্ব পালন করা প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী হুকুমতের পক্ষে সম্ভব ছিল?

Powell Buxton (পওয়েল বাক্সটন) ১৮২৩ সনের মে মাসে বৃটিশ কমন্সসভায় দাসপ্রথা সম্পর্কে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

> দাসপ্রথা বৃটিশ শাসনতন্ত্র ও খ্রিস্টান ধর্ম উভয়েরই নীতি-বিরোধী। অতএব বৃটিশ উপনিবেশ হতে এর ক্রমশ বিলোপ সাধন করা কর্তব্য।

এখানে 'ক্রমশ' শব্দটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বস্তুত এই ধরনের জটিল সামাজিক ব্যাপার সর্বত্রই 'ক্রমশ' সম্পন্ন করার একটি নীতি সর্ববাদীসম্মত হিসেবেই গৃহীত।

তিন. ইসলামের সূচনার যুগে সর্বত্র দাস-দাসী বানানো ও রাখার প্রচলন ছিল। এই অবস্থায় ইসলাম যদি যুদ্ধাবস্থায় দাস-দাসী বানাবার রীতিকে জায়েয ঘোষণা না করত, তবে তাতে ইসলামী শক্তির বিরাট ক্ষতি সাধিত হতো। একদিকে যেসব মুসলমান যুদ্ধে কাফেরদের হাতে বন্দী হতো, তাদেরকে তো গোলাম বানানো হতোই, আর অপরদিকে মুসলমানদের হাতে বন্দী কাফেরদেরকে যদি বিনিময় নিয়ে কিংবা তা ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হতো, তাহলে মুসলমানদের যে কত বিপদের সম্মুখীন হতে হতো, কত ক্ষতি স্বীকার করতে হতো, মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য (Strength) যে কতখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হতো, বিরোধী শক্তি যে কত আশকারা পেয়ে বসতো, তা ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে না। এ কারণে রাসূলে করীম (স) যুদ্ধবন্দীদেরকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে দাস বানাবার অনুকূল নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা, যতক্ষণ বিশ্বজাতি সম্মিলিতভাবে তা বর্জন করতে রাজি না হয় কিংবা মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্ব সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তা করা কিছুতেই না বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে, না ন্যায়নীতির অনুকূল।

চার. যুদ্ধে অনেক সময় পুরুষ বিপুল সংখ্যায় নিহত হয়, আর পশ্চাতে রেখে যায় নারী ও শিশুর এক বিরাট ভিড়। এক্ষণে এসব নারী ও শিশুদের দেখাশোনা, খাদ্য-বস্তু ও রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা না হলে এদের যেমন চরম দুর্দশাগ্রস্ত হবার আশংকা ছিল, অনুরূপভাবে তাদের নৈতিক অধঃপতন হওয়াও ছিল খুবই সম্ভব। আর তার ফল একটি দেশ ও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে— প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর যেমন হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে ও জার্মানীতে।

এ কারণে এ ধরনের নারী ও শিশুদের জন্য কোনো স্থায়ী আশ্রয়-ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। আর সেজন্য একটি বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন লোকের সাথে এদেরকে জড়িত করে দেয়াই অধিকতর নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হতে পারে। একে দাসপ্রথা বলুন আপত্তি নেই, কিন্তু ইসলামে এই ধরনের ব্যবস্থায় যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা দাসত্ব আর গোলামী ছিল না, ছিল সাম্য ও অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব, —তা ইসলামের ইতিহাসই অকাট্যরূপে প্রমাণ করে।

এ সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টিতে চিন্তা করলেও দেখা যাবে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে কয়েক রকমের ব্যবহার করা যেতে পারে : (১) তাদেরকে হত্যা করা হবে, (২) বিনিময় মূল্য নিয়ে কিংবা তা ছাড়াই মুক্ত করা হবে অথবা (৩) রাষ্ট্রীয় জেলখানায় রাষ্ট্রীয় বন্দী (State prisoner) হিসেবে আটক করে রাখা হবে। কিন্তু অনেক সময় অবস্থা এমন হয় যে, এই তিন প্রকারের কোনো একটি পন্থাও কার্যত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। একজন বন্দী শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বুদ্ধি ও যোগ্যতায়-কর্মক্ষমতায় এমন হতে পারে যাতে তাকে হত্যা করা সমাজের ওপর জুলুমেরই নামান্তর। বিশেষতঃ তখন, যখন এই ধরনের ব্যক্তি মুসলিম-দুশমনীতে খুব বেশি অনমনীয় ও অগ্রসর হয় না। এই ধরনের ব্যক্তিকে মুক্ত করে শত্রুপক্ষের হাতে ছেড়ে দেয়াও ক্ষতিকর হওয়ার আশংকা এবং রাজনৈতিক কলা-কুশলতারও (Strategy) বিপরীত হতে পারে। কেননা সে শত্রুপক্ষের সাথে যোগদান করে এটাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলতে পারে, কিংবা শত্রুতার আগুনে ইন্ধন যোগাতে পারে।

সাধারণত দুনিয়ার গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় 'না হত্যা করা যায়, না ছেড়ে দেয়া যায়'— এমন যুদ্ধবন্দীদেরকে কোনো দ্বীপে কিংবা বিচ্ছিন্ন কোনো স্থানে নজরবন্দী করে অথবা জেলখানায় আটক করে রাখা হয়। ইসলাম এই পন্থা অবলম্বন না করে এক নবতর ব্যবস্থা চালু করেছে। আর তা হচ্ছে দাস বানিয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হজম করে সাধারণ মুসলমানের

সাথে মিলিত ও মিশ্রিত (Absorbed) করে নেয়া। এই দুটি ব্যবস্থার মাঝে যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রথম ব্যবস্থায় এসব বন্দীর যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তে। আর তা দেশবাসীর কাছ থেকে অতিরিক্ত কর ধার্য করেই রাষ্ট্রকেই সংগ্রহ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ নজরবন্দী বা কারারুদ্ধ করে রাখা হলে তাদের ভাগ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, মন ও চিন্তাশক্তির স্ফূরণ ও বিকাশদানের কোনো সুযোগই আসতে পারে না। আর এটা সাধারণভাবে মানব সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অথচ এই লোকগুলো স্বাধীন পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা পেলে হয়ত গোটা জাতির পক্ষে খুবই কল্যাণকর হতে পারত।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থায় দাস-দাসীদের যাবতীয় ব্যয়-ভার সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের ওপর বণ্টন করে দেয়া হয়, তারা এই গোলামদের দ্বারা নানা প্রকারের কাজকর্ম করাবার আশায় গোলামদের ব্যয়-ভার বহনের দায়িত্ব খুশি মনে নিজেদের ওপর গ্রহণ করে নেয়। অতপর গোলামরা মন-মগজের উৎকর্ষ সাধন ও তাদের অন্তর্নিহিত ও ঘুমন্ত প্রতিভার স্ফূরণ ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। পরিণামে তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপূর্ব উন্নতি লাভ করতে পারে, যদি না তাদের সাথে অমানুষিক ও পশুজনোচিত ব্যবহার করা হয়। ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, অমুসলিম যুদ্ধবন্দীরা বিজয়ী মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে প্রথমত ইসলামকে জানতে ও বুঝতে পেরেছে এবং ইসলামী আদর্শবাদীদের অপূর্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য অতি কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে ও ইসলাম কবুল করবার সুযোগ পেয়েছে। আর পরবর্তীকালে এই গোলামরাই দুনিয়ায় বিরাট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কীর্তি সম্পন্ন করেছে।

ঠিক এই কারণেই ইসলাম দাসপ্রথাকে একেবারে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত করেনি। বরং সমাজ জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় এই ব্যাপারেও সংশোধন ও ক্রমিক সমাপ্তির পন্থা অবলম্বন করেছে এবং ক্রমশ এই প্রথার বিলোপ সাধনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সংশোধনী প্রচেষ্টায় ইসলামের বিশেষ কর্মপন্থা

বস্তুত ইসলামের স্থায়ী ও চিরন্তন নীতি হচ্ছে যুগ ও সময়ের প্রকৃত ভাবধারার বিরুদ্ধে কখনোই সংগ্রাম না করা। মনবীয় কোনো কোনো দোষ বা বদ রসমকে নির্মূল করতে হলে সহসাই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয়া ইসলামের নীতি নয়। বরং সেজন্য ক্রমিক নীতি অবলম্বনকেই ইসলাম শোভনীয় কর্মপন্থা বলে

মনে করে। ইসলাম ক্রমশ এমন সব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের প্রচার করে, উপদেশ, নসীহত প্রয়োগ করে ও জনগণের মন-মগজে এটাকে বদ্ধমূল করে দেয় যে, এর বিপরীত ভাবধারাসমূহ ধীরে ধীরে আপনা হতেই বিলুপ্ত হয়ে যায় ও চির সমাপ্তি লাভ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলামে নামায ফরয হওয়ার পরও কিছুকাল নামাযের মধ্যেই কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিমগণ যখন নামাযে অভ্যস্ত হলো এবং এতে গভীর মনোনিবেশ করতে লাগল, তখন কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ হলো।

আরবের জনগণ মদ্যপানে প্রায় পাগল ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা একে চির নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই যথেষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই সম্পর্কে তিনটি আয়াত নাযিল করেন এবং শেষবারে চির-নিষেধের ফরমান জারি করা হয়।

গণীমতের মাল সম্পর্কেও এই নীতিই অবলম্বিত হতে দেখা যায়। ইসলামের পূর্ববর্তী ধর্ম ও জাতিসমূহে গণীমতের মাল গ্রহণ যদিও নাজায়েয ছিল, কিন্তু শেষ নবী কর্তৃক ইসলাম যে সমাজে প্রথম প্রচারিত হলো, সে সমাজ ছিল গণীমতের মাল ও দাস-দাসী লাভের জন্য উন্মাদ প্রায়— এটা লাভ করা ছিল তাদের কাছে গৌরবের ব্যাপার। এটা লাভ করার ব্যাপারে আপন ভাই-বেরাদর ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরোয়া বা হিসাব করা হতো না। শত্রুপক্ষ থেকে গণীমত লাভ করা সম্ভব না হলে আপন গোত্রের ওপর আক্রমণ চালিয়ে এটা লাভ করতেও কুণ্ঠিত হতো না। আর কেবল পুরুষরাই নয়, তদানীন্তন সমাজের কোমল-অন্তরসম্পন্না নারীরাও গণীমতের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। পুরুষরা যখন যুদ্ধে যেত তখন তাদেরকে দেবতার নামে শপথ দিয়ে স্ত্রীরা বলত যে, গণীমতের মাল না নিয়ে যেন কেহ গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে। সেকালের আরব কবিদের কাব্য থেকেও গণীমত লাভের এই অদম্য বাসনা ও লালসার কথা আজও জানা যেতে পারে।[১]

এইরূপ অবস্থায় গণীমত গ্রহণের প্রথা হঠাৎ করে বন্ধ করা কোনোক্রমেই সমীচীন ছিল না, বন্ধ করতে চাইলেও তা কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারত না।

১. দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, তদানীন্তন প্রখ্যাত আরবী কবি আকসাম ইবনে ছফী বলে বেড়াত– সর্বোত্তম ও চমৎকার সাফল্য তাই, যাতে খুব বেশি সংখ্যক বন্দী হস্তগত হবে এবং গণীমতের মাল, উট, ইত্যাদি পাওয়া যাবে।

এই কারণে এক্ষেত্রেও ক্রমিক নীতিই অবলম্বিত হতে দেখতে পাই। প্রথমত বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর ধন-মালের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়ার প্রস্তাবকারীদের ভর্ৎসনা করা হয় এবং বলা হয় ঃ

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۞

তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভ করতে ইচ্ছুক, অথচ আল্লাহ্ তো পরকালের সাফল্য চাহেন।

আবার বলা হয় ঃ

وَلَوْ لَاكِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْ تُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ –

খোদার তরফ হতে পূর্ব সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়ে থাকলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ সেজন্য তোমাদের ওপর বিরাট আযাব আসত।

অতপর দুনিয়ার ধন-মালের অন্তসার শূন্যতা ও মূল্যহীনতা নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করা হয় এবং এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, জিহাদের আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা— ধন-ঐশ্বর্য লাভ করা নয়। তারপর গণীমতের মালে মুজাহিদদের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরও অংশ নির্ধারিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই সকল সংশোধনী নীতির পরিণাম এই দেখা যায় যে, মুসলিমগণ গণীমতের মালের জন্য লালায়িত নয়; বরং তারা জিহাদ করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে।

মোট কথা সামাজিক, জাতীয় ও দেশীয় ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রচেষ্টা প্রয়োগের ব্যাপারে ইসলাম বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে এবং এই ব্যাপারে সমাজ, মানব-পরিবেশ, সামগ্রিক মনস্তত্ব ও ভাবধারার প্রতি কখনোই উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়নি। দাসপ্রথাও এ পর্যায়েরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিলতম ব্যাপার। একেতো দাসপ্রথা ছিল তদানীন্তন আরব ও অন্যান্য সকল দেশের সামাজিক ও নাগরিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নবী করীম (স) যদি একে হঠাৎ করে বন্ধ করতে চাইতেন, তবুও তাতে সাফল্য সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত সমসাময়িক সমাজ ও সভ্যতার, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সতর্কতার দাবিও একে হঠাৎ করে বন্ধ করার অনুকূল ছিল না। এসব কারণেই নবী করীম (স) একে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করার অনুকূলে কোনো ঘোষণা বাণী প্রচার করেননি। করেননি বটে, কিন্তু এজন্য তিনি এমন সব বাস্তব ও ব্যবহারিক কার্যকরী ব্যবস্থাবলী চালু করেছেন, যার ফলে দাসপ্রথা কার্যত আর দাসত্ব থাকল না; বরং এটি অনতিবিলম্বে পরম ভ্রাতৃত্বে পরিণত হয়ে গেল।

যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানো যেতে পারে

এ পর্যায়ে বিশ্বনবীর (স) সর্বপ্রথম অবদান হলো, তিনি দাস ও দাসী বানাবার প্রাচীনকাল হতে চলে আসা বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে একটি মাত্র পন্থাকেই অবশিষ্ট রেখেছিলেন। ইসলামের পূর্বে সাধারণ প্রচলন হিসেবেই দারিদ্র্যের কারণে কিংবা ঋণের চাপে বাধ্য হয়ে লোকেরা নিজেদেরকে অথবা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে কোনো ধনশালী ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিত। সে তাদেরকে দাস বা দাসী বানিয়ে নিত। এতদ্ব্যতীত অপরাধের শাস্তি বা জুয়া খেলায় বাজি ধরার দরুণও অনেককে দাস বা দাসী বানিয়ে নিত।[১] অনেককে অপহরণ বা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে দাস বা দাসী বানিয়ে রাখা হতো।[২] ইহুদী ধর্মে এই কাজ কোনোরূপ অপরাধ মনে করা হতো না। অন্যদিকে খ্রিস্টান সমাজে অপহরণপূর্বক ধরে নেয়া গোলাম বানিয়ে রাখার ব্যাপক প্রচলন ছিল। খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান প্রচারক লর্ড ক্রসার নিজে বলেছেন ঃ

যেসব ব্যাপার খ্রিস্টানদের জন্য খুবই লজ্জাকর, তন্মধ্যে একটি হলো, তারা শুধু দাস বানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। তা অপেক্ষাও অনেক খারাপ কাজ তারা করিয়েছে। আর তা হলো, তারা লোকদেরকে হরণ করে নিয়ে যেত এবং জোরপূর্বক গোলাম বানিয়ে রাখত'।

নবী করীম (স) দাসত্বের এসব প্রকার ও পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও খোদায়ী আযাবের কারণ বলে ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে বলেছেন, এটা মানবতা পরিপন্থী ও মনুষ্যত্বের চরম অবমাননাকারী। তিনি শুধু একটি পন্থাকেই অবশিষ্ট রেখেছেন। তাহলো, যুদ্ধে যারা বন্দী হবে, শুধু তাদেরকেই দাস বা দাসী বানানোর পন্থা এবং তা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ারভুক্ত। উপরন্তু এও ভুললে চলবে না যে, এই অবস্থায়ও দাস-দাসী বানাবার কোনো নির্দেশ নেই, এ শুধু অনুমতি পর্যায়ে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পন্থা ও উপায় সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে হারাম, একেবারেই নাজায়েয, অবৈধ। নবী করীম (স) স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

১. আবুল ফরজ ইসফাহানী লিখিত কিতাবুল মাগাজী গ্রন্থে এই পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

২. নবী করীমের মুক্ত গোলাম জায়দ ইবনে হারেসা প্রথমদিকে পথিমধ্যে ধৃত হয়ে ওকাজ বাজারে দাসরূপে বিক্রি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি খাজিদ বিনতে খুয়াইলিদের মালিকানায় চলে গিয়েছিলেন। হযরত খদিজা পরে তাকে নবী করীম (স) এর জন্য হেবা করেছিলেন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلاثٌ اَنَاخَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ اَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اَسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ -(بخارى)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, কেয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করব— আর আমি যাদের বিরুদ্ধে ঝগড়া করব, আমি তাদের উপর অবশ্যই জয়ী হব। তাদের একজন হলো সেই ব্যক্তি যে আমার নামে দিল এবং পরে বিশ্বাসঘাতকা করল। দ্বিতীয়জন সে, যে কোনো স্বাধীন মুক্ত ব্যক্তিকে বিক্রি করে এর মূল্য ভক্ষণ করল এবং তৃতীয় সে, যে কোনো মজুরকে মজুরির বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করার পর তার দ্বারা কাজ আদায় করে নিল কিন্তু তার মজুরি দিল না।

অপর এক হাদীস অনুযায়ী উপরোক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন হলো ঃ

وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرًا (ابوداود ابن ماجه)

যে ব্যক্তি কোনো আজাদ মুক্ত-স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বানাল।

এখানে 'দাস বানাল যে শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে, এর তাৎপর্য হলো, কাউকেও জোরপূর্বক দাস বানানো বা কারও আজাদীকে অস্বীকার করা; কিন্তু সে জানতো যে, এই ব্যক্তি দাস না; কিন্তু তা প্রকাশ করল না এবং যথাসময়ে সে চুপ থাকল।

মানুষের স্বাধীনতা জন্মগত ও মৌলিক

হযরত আমর ইবনুল আ'ছ (রা) হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মিসরের কিবতী নাগরিকদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাতেন, এই অভিযোগ পেয়ে হযরত উমর (রা) সাথে সাথে তাঁকে লিখলেন ঃ

يَاعَمْرَو مُنْذُ كَمْ تَعَبَّدْتُمْ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ اُمَّهَا تُهُمْ اَحْرَارًا (حسن المحاضرة للسيوطى)

হে আমর, তুমি জনগণকে কবে হতে গোলাম বানাতে শুরু করেছ, অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন ও মুক্তরূপেই প্রসব করেছিল ?

এই উক্তি হতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন, মুক্ত ও আজাদ। স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। দাসত্ব হলো বাইরে হতে চাপানো বিপদ ও বন্ধন। কোনো স্বাধীনত মুক্ত ব্যক্তি নিজেকে 'দাস' বললেও তাকে দাস মনে করা যাবে না। কেননা, প্রতিটি মানুষের মৌলিক অবস্থা হলো সে মুক্ত, স্বাধীন এবং আজাদ।

এমনকি একজন কাফের ও একজন মুসলিম ব্যক্তি যদি একসাথে কোনো বালককে পথে পড়া অবস্থায় পেয়ে যায় এবং সে সম্পর্কে মুসলিম ব্যক্তি যদি দাবি করে যে, সে তার দাস আর কাফের ব্যক্তি দাবি করে যে, সে তার সন্তান, তাহলে মুসলিম ব্যক্তির দাবি অগ্রাহ্য হবে, কাফের ব্যক্তির দাবি গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে তাকে মুক্ত ও স্বাধীন মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামে মানুষের স্বাধীনতা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা এই বক্তব্য থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যুদ্ধ

উপরে বলা হয়েছে, ইসলামে কেবলমাত্র যুদ্ধবন্দীদের গোলাম বানানো যেতে পারে। এই প্রেক্ষিতে শরীয়তের দৃষ্টিতে যুদ্ধ পর্যায়ে মৌলিক আলোচনা আবশ্যক। যে যুদ্ধে বন্দীদের গোলাম বানানো যায়, তা কোন ধরনের যুদ্ধ ? তা কি দাস-দাসী সংগ্রহের জন্য করা হয়; কিংবা এর ফলে অন্যান্য মানুষ বা জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী বন্ধনে বন্দী করার উদ্দেশ্যে করা হয় ? দুনিয়ায় ফেতনা-ফাসাদ, হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাট করার জন্য যে যুদ্ধ করা হয়, সেই যুদ্ধে বন্দী হওয়া লোকদেরকেও কি দাস বানানো যাবে ? .... এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই, ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, ইসলাম প্রচলিত অর্থে কোনো যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় না, ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে 'জিহাদ' করার জন্য এবং জিহাদ নিশ্চয়ই কোনো দেশ দখল করে নেয়া বা কোনো স্বাধীন-মুক্ত জনসমষ্টিকে অধীন ও দাস বানিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় না। ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, যা ফেতনা-ফ্যাসাদ— অখোদার তাগূত রাজত্ব-সার্বভৌমত্ব নির্মূল করে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মুসলিমসহ অন্যান্য সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার আদায়ের সুদৃঢ় ব্যবস্থা কার্যকর করা, যেন কোনো শক্তিই তাদেরকে পর্যুদস্ত ও অধিকার বঞ্চিত করতে না পারে— তার ব্যবস্থা করা জিহাদের শুভ ফসল বলে গণ্য। কুরআন মজীদে তাই ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

তোমরা ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যেন কোথাও ফেতনা না থাকে এবং দ্বীন— আধিপত্য কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ও নিরঙ্কুশভাবে যেন এক আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা যদি ইসলাম বিরোধিতা হতে বিরত হয়, তাহলে তারা যা কিছু করবে সেদিকে আল্লাহ্‌ই দর্শক থাকবেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ও যুদ্ধ চলাকালেও প্রতিপক্ষ সন্ধি করতে প্রস্তুত হলে মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ হলো, তারা যেন সন্ধি করে নেয়।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

তারা সন্ধি করতে রাজি হলে তোমরাও রাজি হয়ে যাও এবং আল্লাহ্‌র ভরসা করো।

ইসলামে যুদ্ধ পর্যায়ে একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ্য। হাদীসটি বুখারী শরীফ ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবনে বরীদাহ তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনে। হাদীসটি এই ঃ

রাসূলে করীম (স) যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো বাহিনীর অধ্যক্ষ বা নেতা বানাতেন, তখন তাকে নির্দেশ দিতেনঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকবে, তোমার সঙ্গের মুসলমানদের সাথে ভালো আচরণ গ্রহণ করবে। পরে বলতেনঃ আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে জিহাদ করবে, যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যুদ্ধ করবে, কিন্তু খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ধোকা দেবে না, কারো দেহ বিকৃত করবে না। বাচ্চা বয়সের লোককে হত্যা করবে না। তোমরা যখন তোমাদের দুশমন মুশরিকদের সম্মুখবর্তী হবে, তখন তাদেরকে তিনটি কথার যে কোনো একটি গ্রহণের আহ্বান জানাবে। এর যে কোনো একটি গ্রহণ করলে তা বিশ্বাস করে মেনে নেবে এবং তাদের ওপর আক্রমণ করা হতে নিজের হাত ফিরিয়ে নেবে। কথা তিনটিঃ তাদেরকে ইসলাম কবুল করার জন্য আহ্বান জানাবে। তারা রাজি হলে তোমরা তাদের কথা মেনে নেবে এবং যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। পরে তাদেরকে নিজেদের দেশ ত্যাগ করে দারুল-মুহাজিরীন মদীনার দিকে হিজরত করতে বলবে। তারা এ কথা না মানলে তাদেরকে বলবে, তাদের সাথে মরুভূমির মুসলিমদের ন্যায় আচরণ করা হবে, ফাই ও

গণীমতের কোনো অংশ তারা পাবে না। সে লোকেরা ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করলে তাদেরকে (ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে) জিজিয়া দিতে রাজি হতে বলবে। তারা তা মেনে নিলে ভালোই, তাদের কথা মেনে নাও এবং তাদের ওপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকো। কিন্তু তারা জিজিয়া দিতে রাজি না হলে তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করো এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো। তোমরা কোনো দুর্গ অবরোধ করে বসলে তখন তারা যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (স) 'যিম্মা' প্রার্থনা করে, তাহলে তোমরা তা দেবে না, তোমরা তোমাদের নিজেদের ও নিজেদের সঙ্গীদের যিম্মা দেবে। কেননা, তোমরা নিজেদের দেয়া 'যিম্মা' ভঙ্গ করলে আল্লাহ্ ও রাসূলের (স) যিম্মা ভঙ্গ করা অপেক্ষা তা অনেক উত্তম।

এই হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামের কতিপয় সাধারণ যুদ্ধ-আইন পাওয়া যায়। তা এই ঃ

১. যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে প্রতিপক্ষকে সাধারণভাবে দ্বীন-ইসলাম কবুল করার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। অন্যথায় তাদের আক্রমণে যারা নিহত হবে, তাদের রক্তমূল্য দিতে হবে।

২. বেসামরিক নারী, বাচ্চা ও ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহে অবস্থানকারী উপাসনায় রত পাদ্রী-পুরোহিত-ঠাকুর, বয়োবৃদ্ধ, পঙ্গু, রোগী এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এমন সব লোককে হত্যা করা যাবে না।

৩. ক্রীতদাস, চাকর-নকর ও সেবাকারীদের হত্যা করা নিষিদ্ধ।

৪. ধোকা-প্রতারণা দেয়া ও শত্রুর দেহের নাক-কান কাটা নিষিদ্ধ, জীবিত বা মৃত মানুষকে জ্বালিয়ে মারা যাবে না। ফলের বাগান, ক্ষেত-খামার, বসতবাড়ী ধ্বংস করা, সরঞ্জামাদি পুড়িয়ে দেয়া চলবে না। গাছপালা কাটা বা পানিতে বিষ মেশানোও নিষিদ্ধ।

এসব শর্তের সীমার মধ্যে যে জিহাদ করা হবে তার ফলে যারা বন্দী হবে, কেবলমাত্র তাদেরকেই দাস বা দাসী বানিয়ে রাখা যেতে পারে।

বস্তুত দাস-দাসী সংগ্রহ করার ও চরম বিপর্যয় ও নিছক ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুদ্ধ করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। কোনোরূপ ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবার জন্য যুদ্ধ করলে তা জিহাদ হবে না, সেদিকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না। জিহাদ করতে হবে কেবলমাত্র দ্বীন-ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ফলে যুদ্ধে লোকদের ধর-পাকড়ের আশা খুবই সামান্য এবং

দাস-দাসী বানানোর সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, না থাকার মতো। তাছাড়া প্রতিপক্ষের সম্মতিতে সন্ধি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশি রয়েছে। এমতাবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসী বানানো যেতে পারে বলে এর পথ প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ

ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই একই পিতা-মাতার সন্তান। এর ফলে দাস-দাসী সম্পর্কিত ধারণা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গ্রীক ও রোমান দার্শনিকগণও দাসদেরকে এক স্বতন্ত্র জীবন্ত ও কর্মতৎপর হাতিয়ার মনে করেছে। হিন্দু দর্শনে শূদ্ররা সৃষ্টিই হয়েছে ব্রাহ্মণদের সেবা করার জন্য। কেবল মনিবদের সেবায় প্রাণপাত করাই তাদের কাজ। পালিত কুকুর ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উর্ধ্বে তাদের কোনো স্থান নেই। কিন্তু ইসলাম দাসদেরকেও 'মানুষ' গণ্য করে মনুষ্যত্বের উচ্চ মর্যাদায় গণ্য করেছে। নানাভাবে তাদের সম্পর্কে হীন, জঘন্য ও অপমানকর ধারণাকে পরিবর্তন করেছে। দাসদের মুক্তি পর্যায়ে এটা ইসলামের দ্বিতীয় এবং মৌলিক অবদান।

ইসলাম উপস্থাপিত ধারণায় গোলামরাও মানুষ এবং মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই, উচ্চ-নিচ, আশরাফ-আতরাফের কোনো পার্থক্য তারতম্যই স্বীকৃত নয়। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং গোলামরাও সেই গোলাম নয় যা অন্যান্য সভ্যতা ও ধর্ম-দর্শনে রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে গোলামরা প্রথমে সাধারণভাবে মানুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত এবং দ্বিতীয়ত তারা মানুষের ভাই। তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রক্ষা করা ইসলামের সুস্পষ্ট ও অত্যন্ত তাগিদপূর্ণ নির্দেশ। হাদীসে ঘোষিত হয়েছে, গোলামরা তোমাদের ভাই, তারা তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন— শুধু এতটুকুই পার্থক্য। অতএব তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এসব ভাইকে তাই খেতে দেবে, যা তোমরা খাও, তাই-ই পরতে দেবে, যা তোমরা পরো এবং কোনো দুরূহ কাজের চাপ তাদের ওপর কখনোই চাপিয়ে দেবে না। রাসূলে করীম (স)-এর ভাষায় গোলামকে মনিবের 'পিতা' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এ কারণেই গোলামকে 'গোলাম' বলতেও সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। বরং তাকে 'বালক' (boy) বলে ডাকতে এবং তাকে কোনোরূপ গালাগাল করতেও নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের এই বিশেষ শিক্ষার কারণেই হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় মহাসম্মানিত সাহাবী ও খলিফা ক্রীতদাস হযরত বিলাল হাবশীকে 'মওলানা'— 'আমাদের মনিব' বলে সম্বোধন করতেন। বলতেন,

হযরত আবু বকর (রা) 'আমাদের মনিব'-কে মুক্ত করে দিয়েছেন। হযরত সালমান ফারসী বংশের ক্রীতদাস ছিলেন। রাসূলে করীম (স) বলেছিলেনঃ 'সালমান তো আমাদের পরিবারভুক্ত একজন।'

মনে রাখা আবশ্যক, ইসলাম ক্রীতদাস-দাসীদের এই অভিন্ন মানবোপযোগী মর্যাদা দিয়েছে ইতিহাসের সেই যুগে— সভ্যতার সেই অধ্যায়ে যখন আরব সমাজ ও বহির্বিশ্বের অন্যান্য সকল সমাজ ও সভ্যতায় ক্রীতদাসদের অত্যন্ত হীন-ইতর প্রাণী বিশেষ মনে করা হতো। রোমান সমাজে একজন সম্রাজ্ঞীর জানাযার সাথে চলতে চলতে একজন ক্রীতদাসী থু থু নিক্ষেপ করার অপরাধে তাৎক্ষণিকভাবে বন্দী হয় ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল।

স্বয়ং নবী করীম (স)-এর নীতি ছিল গোলাম বানানোর বিপক্ষে; বিনিময় মূল্য গ্রহণ করে যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেয়াই ছিল তাঁর প্রধান চেষ্টা। প্রথমে বন্দীদের সাথে সমান ও অভিন্ন মানবিক আচরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিতেন। বদর ও হুনাইনের যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ও মুসলমানদের চিরকালীন দুশমন ও স্বয়ং রাসূল (স)-এর ওপর দৈহিক নির্মম নির্যাতনকারী কাফেররা বন্দী হয়ে এলে তিনি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। বললেন ঃ কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমরা সকলেই সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। তায়েফ অবরোধ করার পর মুশরিকদের যত গোলামই রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তাদের সকলকেই তিনি মুক্তিদান করেছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, এই মুক্ত গোলামদের এক একজনকে এক একজন সাহাবীর দায়িত্বে সোপর্দ করে দিলেন এবং তাদের খাওয়া-পরা থাকার ব্যবস্থা করার সাথে সাথে দ্বীন-ইসলামের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে 'সকীফ' গোত্রের কর্তা ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করলে তারা এই গোলামদের ফেরত পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী করীম (স) বললেনঃ 'না, ওরা আল্লাহ্‌র মুক্ত মানুষ।'

উত্তরকালে ইসলামের স্বর্ণযুগে দাস প্রথার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময় দাস প্রথা প্রকৃতপক্ষে দাসত্বের প্রথা ছিল না, তখন তা সম্পূর্ণরূপে সৌভ্রাতৃত্ব ও অভিন্ন সমতায় পরিবর্তিত হয়েছিল। হযরত উমর (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়কার সমস্ত গোলামদের মুক্তিদান করেছিলেন এবং সাথে সাথেই ঘোষণা করলেন, আরববাসীদের কখনোই গোলাম বানানো যেতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত জাহিলিয়াতের যুগে যারা ক্রীতদাস হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তারা যেন তাদের মনিবদের বিনিময় মূল্য আদায় করে মুক্তি অর্জন করে। এর অর্থ এই ছিল যে, মালিক রাজি হোক আর নাই হোক, ক্রীতদাস তার মূল্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি অর্জনের অধিকারী। তা দিয়ে দিলেই তারা স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে।

বুখারী শরীফে হযরত উমর (রা)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ "যিম্মীদেরকে গোলাম বানানো যেতে পারে না। যেসব ক্রীতদাসী তাদের মনিবদের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করবে, তারা আর ক্রীতদাসী থাকবে না। অতপর তাদের ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।" এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের হুকুম ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۚ

তোমাদের মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসদের মধ্যে যারাই মূল্য আদায়ের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করতে প্রস্তুত হবে, তোমরা অবশ্যই তাদের সাথে চুক্তি করবে যদি তোমরা তাদের মধ্যে কোনোরূপ কল্যাণ জানতে পার।(আন্-নূর ঃ ৩৩)

এ ব্যাপারে কুরআন খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে। এটা ছিল বিনিময় নিয়ে ক্রীতদাসকে মুক্তিদানের চুক্তি করবার সুস্পষ্ট নির্দেশ। হযরত উমর (রা) এই নির্দেশ পুরাপুরি কার্যকর করেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের বড় বড় এলাকা দখল করা হয় এবং এসব যুদ্ধে লাখ লাখ লোক বন্দী হয়। কিন্তু মাত্র দুই-একটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও যুদ্ধ বন্দীদের গোলাম বানানো হয়নি। খ্রিস্টান অধ্যুষিত বুসরা, ফহল, হিমচ, দেমাশক, ইনতাকিয়া ও তাবরিয়ায় প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইসলামী খিলাফতের অধিকারভুক্ত হয়। খ্রিস্টান অধিবাসীরা প্রাণপণ যুদ্ধ করার পর পরাজিত ও বন্দী হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাউকেও গোলাম বানাবার কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়নি। মুসলমানরা মিসর আক্রমণ করলে পরাজয় আসন্ন দেখে মিসর অধিবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) যে সন্ধিপত্রে সাক্ষর করেন, তাতে লেখা হয়েছিল ঃ

لَا تُبَاعُ نِسَائُهُمْ وَاَبْنَائُهُمْ وَلَا يَسْتَرِقُّوْنَ -

পরাজিতদের নারী ও পুত্রদের বিক্রয় করা হবে না, তাদেরকে দাস-দাসীও বানানো হবে না।

আলেকজান্দিয়া দীর্ঘ তিন মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ থাকার পর মুসলমানদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। তথাপি তাদেরকে হত্যাও করা হয়নি, বন্দী করে গোলামও বানানো হয়নি।

দাস মুক্তির কার্যকর পন্থা

ইসলামে কেবলমাত্র যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানোর যে সংকীর্ণ ও সামান্যতম সুযোগ রয়েছে, তা ব্যবহার করে যারা দাস-দাসী রাখার সাধ পূরণ করছিল, তাদেরকেও নানাভাবে দাস-দাসী মুক্তিদানের জন্য বিপুল উৎসাহ দেয়া হয়েছে। একটি হাদীসে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

مَنِ اعْتَقَ نَسَمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ لِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنَ النَّارِ (بخارى، مسلم)

যে ব্যক্তি একজন দাসকে মুক্তি দান করল, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিটি অঙ্গকে মুক্ত দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দান করবেন।

সূরা আল-বাকারার যে আয়াতটিতে ঈমান ও নেক আমলের কথা বলা হয়েছে, তাতে নামায-রোযার পূর্বেই অগ্রাধিকার দানের লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে দাস মুক্তির বিষয়। আয়াতটি এই ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ .....

কিন্তু সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ হলো তার, যে ঈমান আনল আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি। তাঁরই মহব্বতে নিকটাত্মীয় ইয়াতিম, মিসকিন, নিঃস্ব পথিক, প্রার্থী ও দাস মুক্তিতে অর্থ ব্যয় করল এবং নামায কায়েম করল, যাকাত আদায় করল ...।

এই আয়াতটিকে ইসলামের ঈমানী বিষয়াদির উল্লেখের পর যেসব বড় বড় কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে দাস মুক্তিতে অর্থ ব্যয়ের কথাও রয়েছে। বস্তুত কুরআনের দৃষ্টিতে এ যে অতি বড় সওয়াবের কাজ, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكِّ الرَّقَبَةَ -

গোলাম স্বাধীন করো এবং গলদেশ মুক্ত করো।

জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুটি কথার মধ্যে তো কোনো পার্থক্য মনে হয় না। রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ এই দুটি কথা অভিন্ন নয়। প্রথম বাক্যের অর্থ, তুমি নিজে কোনো দাসকে মুক্তি দেবে এবং দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ, কোনো দাসের মুক্তিলাভে তুমি সাহায্য-সহায়তা করবে।

কুরআনের এসব আয়াত ও হাদীসের উক্তির ভিত্তিতে ফিকাহবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, সকল প্রকারের দান-সাদকা ও নেক আমলের মধ্যে দাস মুক্তির কাজটি শীর্ষস্থানীয় ও সর্বোত্তম। এই কারণে স্বয়ং নবী করীম (স) এই কাজটি খুব বেশি করে করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের (রা) নিজ নিজ আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী দাস মুক্তির কাজ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এই দাস মুক্তির অধ্যায় অতীব উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে।

নবী করীম (স) হযরত জায়দ ইবনে হারেসাকে মুক্ত করে স্বীয় পালিত পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং নিজের চাচাতো ভগ্নিকে তার কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। সওবানকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন কা'বা ঘরের ঝাড়ুদার। আবু রাফে, সালমান ফারেসী, আবু কাবশা, ইয়াসার, রুয়াইকা প্রমুখও তাঁরই মুক্ত (ক্রীতদাস) ছিলেন। মারিয়া কিবতিয়া ও রাইহানা নামের দুইজন ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে তিনি তাদেরকে স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। শেষোক্তজনের গর্ভে তাঁর সন্তান ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

নবী করীম (স)-এর এই উচ্চতর মহান মানবিক আদর্শের অনুসরনে সাহাবায়ে কেরাম (রা) নিজেদের আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী দাস ক্রয় করে মুক্ত করার কাজে বিরাট অবদান রেখেছেন। তাঁরা এতে বিপুল সওয়াব হবে বিশ্বাস করেই এই কাজ করেছেন। হযরত বিলাল ইবনে রিবাহ, আমের ইবনে ফুহাইরা, আবু ফুকাইহা, জুনাইরা, লবীনা, নাহদিয়া, উম্মে উবাইস প্রমুখ হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক দাসত্ব শৃংখল হতে মুক্তি লাভে ধন্য হয়েছিলেন। হযরত আবু বকরের (রা) ন্যায় হযরত উসমান (রা)ও এই কাজে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রতি জুমার দিনে একজন করে দাস মুক্তকরণ ছিল তাঁর বহুদিনের রীতি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে ক্রীতদাস নিয়মিত ও আন্তরিকতা সহকারে নামায আদায় করবে, আমি তাকে মুক্ত করব। হাকীম ইবনে হাজাম ইসলাম কবুলের

পূর্বে এক ক্রীতদাস মুক্ত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি অনুরূপভাবে একশত গোলাম মুক্ত করেছিলেন। হযরত ইবনে উমর (রা) তাঁর যে গোলামকেই মসজিদে ইবাদতে মশগুল দেখতে পেতেন, তাতে তিনি খুবই উৎফুল্ল হতেন এবং তাকে মুক্ত করে দিতেন।

গোলাম স্বাধীন করার কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

اَغْلَ هَا ثَمَنًا وَاَنْفَسِهَا عِنْدَ اَهْلِهَا -

যে ক্রীতদাসের মূল্য অধিক এবং মালিকের কাছে যে অধিক প্রিয়, তাকে মুক্ত করে দেয়ায় অধিক বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে।

এই ব্যাপারে মুসলমান গোলাম ও কাফের গোলামের মধ্যে কোনোই পার্থক্য করা হয়নি। গোলাম মুক্তি সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

وَلَاخِلَافَ اَنَّ مُعْتِقَ الرَّقَبَةِ الْكَافِرِمُثَابٌ عَلَى الْعِتْقِ (نيل الاوطار-ج ٦)

কাফের গোলাম মুক্ত করলেও যে শুধু এই মুক্তিদানের কারণে সওয়াব পাবে, তাতে ইসলাম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

ইমাম মালেক (রা) আরও স্পষ্ট ও উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন ঃ

وَلَابَأْسَ اَنْ يُّعْتِقَ النَّصْرَانِى وَالْيَهُوْدِىَّ وَالْمَجُوْسَ تَطَوُّعًا -

খ্রিস্টান, ইহুদী ও অগ্নিপূজক প্রভৃতি ক্রীতদাসদেরকে মুক্ত করলেও যে সওয়াব হবে, তা নিসন্দেহ।

গুনাহের কাফফারা হিসেবে দাস মুক্তি

ইসলামে বিভিন্ন গুনাহের কাফফারা হিসেবে দাস মুক্তকরণের জন্য বলা হয়েছে। যারা নিজেদের উৎসাহে ও সওয়াবের আশায় গোলাম মুক্ত করার কাজে অগ্রসর হয় না, তাদের দ্বারাও দাসমুক্তির কাজ করানোর লক্ষ্যে এই বিধান দেয়া হয়েছে। এই গুনাহসমূহের মধ্যে কয়েকটিতে গোলাম মুক্তকরণ মুস্তাহাব বা উত্তম, আর কয়েকটিতে তা ওয়াজিব পর্যায়ে গণ্য।

ভুলবশত কাউকেও হত্যা করা হলে একটি দাস মুক্ত করে এর কাফফারা দেয়া একান্তই জরুরি হয়ে পড়ে। এটা কুরআন মজীদের স্পষ্ট ঘোষণা। বলা হয়েছে :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ -

কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ভুলবশত কেউ হত্যা করলে হত্যাকারীকে একজন মু'মিন ক্রীতদাস অবশ্যই মুক্ত করতে হবে।

ভুলবশত নিহত ব্যক্তি অমুসলিম হলেও তার এটাই কাফফারা হবে। সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর কোনো ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করা হলেও এই একই পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কেউ স্ত্রীকে নিজের মা, ভগ্নি ইত্যাদি কোনো মুহাররম আত্মীয়ার সাথে সাদৃশ্য দেখালে ইসলামের বিধান অনুসারে তাকে নিজের কথা প্রত্যাহার করতে হবে এবং কাফফারা স্বরূপ যে তিনটি কাজের বিধান রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো দাস মুক্তকরণ। এই দাসের মুসলিম হওয়ার শর্ত নেই। যেকোনো দাসকে মুক্ত করা হলেই কাফফারা আদায় হবে। কেউ কোনো বিষয়ে কসম করলে পরে তা ভঙ্গ করলে বা ভঙ্গ করতে ইচ্ছা করলে তাকে কাফফারা বাবদ যে তিনটি কাজের একটি করতে হবে, তাহলো গোলাম মুক্তকরণ। কেউ ইচ্ছা করে রোযা ভাঙলে তাকেও গোলাম স্বাধীন করে কাফফারা দিতে হবে।

এছাড়াও ছোট ছোট গুনাহের কাফফারা বাবদও গোলাম স্বাধীন করার বিধান দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ اَوْضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُّعْتِقَهُ -(ابوداؤد)

যে লোক তার গোলামকে চপেটাঘাত করবে বা তাকে মারবে, তার কাফফারা হলো তাকে মুক্তি করা।

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণকালে যেমন নামায পড়ার বিধান করা হয়েছে, ঠিক তেমনই গোলাম স্বাধীন করার কথাও বলা হয়েছে। এমনকি কেউ যদি ঠাট্টা-মশকরা স্বরূপও নিজের গোলামকে স্বাধীন করার কথা মুখে উচ্চারণ করে বসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাহলেও তার গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। মৃতদের নামে গোলাম স্বাধীন করা হলে এর সওয়াব তারা পাবে বলেও হাদীসে বলা হয়েছে। খাজরাজ গোত্রের সরদার হযরত সায়াদ ইবনে উবাদাহ (রা) তাঁর মৃত মায়ের নামে এবং হযরত আয়েশা (রা) তাঁর ভাই আবদুর রহমানের ইন্তেকালে গভীরভাবে ব্যথিত হয়ে বিপুল সংখ্যক গোলাম স্বাধীন করেছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউ ইন্তেকাল করলে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা রাসূলে করীম (স)-এর উপদেশ অনুযায়ী তার নামে গোলাম স্বাধীন করতেন। হযরত আবুল হাই সাম আনসারী

(রা)কে নবী করীম (স) একজন গোলাম উপহার স্বরূপ দিয়ে তার সাথে ভালো আচরণ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তাঁর স্ত্রী এই কথা শুনে বললেন, তোমার দ্বারা তা হবে না, একে মুক্ত করে দেয়াই ভালো। ফলে তিনি একে মুক্ত করে দিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) ইসলাম কবুল করতে এসে রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসা গোলামকে মুক্ত করে দিলেন।

হাদীসে উদ্ধৃত এসব বর্ণনা থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়, ইসলামের মৌল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহাবায়ে কেরাম যে কত বিপুল সংখ্যক গোলামকে স্বাধীন করে দিয়েছেন, তার সংখ্যা নির্ণয় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাহাবা কর্তৃক মুক্ত গোলামদের সংখ্যা উনচল্লিশ হাজার দুইশ' ঊনষাট পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর স্বয়ং নবী করীম (স) কর্তৃক স্বাধীন করা গোলামদের সংখ্যা বলা হয়েছে তেষট্টি।

গোলাম স্বাধীন করার জন্য ইসলাম যেসব পন্থার উদ্ভাবন করেছে, উপরোক্ত বর্ণনা হতে তা স্পষ্ট জানা যাচ্ছে। কিন্তু উপরোক্ত উপায়সমূহ প্রধানত স্বেচ্ছা ভিত্তিক, সওয়াবের বাসনায় করা কাজ স্বরূপ। কিন্তু যদি কেউ নিছক সওয়াবের আশায় গোলাম মুক্ত করতে না চায়, তাহলে কি তাদের ভাগে মুক্তি জুটবে না? —তা নিশ্চয়ই হতে পারে না। এই কারণে কেবল সওয়াব পাওয়ার আশায় উদ্বুদ্ধ করেই কার্যত দাসপ্রথার বিলোপ সাধনের মহান কার্যকে ছেড়ে দেয়া হয়নি। স্বয়ং গোলামদের জন্য এমন সব পন্থারও নির্দেশ করা হয়েছে, যার আশ্রয় নিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হতে পারে।

এই পর্যায়ের একটি হলো 'মুকাতিবাত'। ইসলামে স্ত্রীদের তালাক পাওয়ার জন্য যেমন 'খোলা' ব্যবস্থা করা হয়েছে— তারা স্বামীর কাছ থেকে তালাক পাওয়ার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করতে পারে, স্বামী তালাক দিতে রাজি না হলেও এই পন্থায় তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারে। ঠিক তেমনই গোলামদেরকেও এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তারা মালিকের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়ার শর্তে চুক্তি করে মুক্তি লাভ করতে পারে। এই পর্যায়ে ইতিপূর্বে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে। বুখারী শরীফের বর্ণনানুযায়ী আয়াতে চুক্তিবদ্ধ হবার জন্য যে নির্দেশের উল্লেখ হয়েছে এটা পালন করা প্রত্যেক মালিকের জন্য ওয়াজিব। হযরত আনাসের গোলাম তার সাথে এই চুক্তি করতে চাইলে তিনি মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে হযরত

উমর (রা) এটা জানতে পেরে এটা মেনে নেবার জন্য হযরত আনাসকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি রাজি হলেন না দেখে হযরত উমর ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত আনাসকে দোররা মারতে উদ্দত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আনাস তা মেনে নিতে রাজি হয়ে যান।

চুক্তিকারী গোলাম নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে মুক্তি লাভে সমর্থ না হলে যাকাত বাবদ সংগৃহীত অর্থ থেকে তার মুক্তির ব্যবস্থা করা ইসলামের স্থায়ী বিধান। যাকাত বণ্টনের যে আটটি খাতের উল্লেখ কুরআনে রয়েছে, তন্মধ্যে একটি খাত হলো মুক্তিকামী গোলামদের জন্য অর্থ ব্যয়। এই কাজে সব মুসলমানকেই অংশগ্রহণেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বিনিময় মূল্য আদায় করে দিতে পারলেই গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। মালিক রাজি না হলেও এবং মুখে মুক্তির বাণী উচ্চারণ না করলেও কোনো অসুবিধা দেখা দেবে না।

এমনিভাবে মালিক ক্রীতদাসকে লক্ষ্য করে বলে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত, তাহলে তার মৃত্যুর পরই গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। উম্মে আলাদ অর্থাৎ মনিবের ঔরসজাত সন্তানের মা হতে পারলেও ক্রীতদাসী মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে মুক্ত ও আজাদ হয়ে যাবে। মনিব জীবিত থাকাকালে তাকে বিক্রয় করতে পারবে না। কাউকে দান করতে পারবে না, কারও অংশে পড়বে না।

বস্তুত দাস প্রথার চির অবলুপ্তির জন্য ইসলাম যেসব কার্যকর পন্থার নির্দেশ করেছে, তদানুযায়ী আমল করা হলে ধরাপৃষ্ঠের কোথাও একজন গোলামেরও অস্তিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। এই কারণে ইংল্যাণ্ডের ইসলাম বিদ্বেষী লেখক গোলড স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং বলেছেন ঃ

> যেসব দেশে দাসপ্রথা বিরাজমান, সেসব দেশে ইসলামের নবী কর্তৃক গোলাম মুক্ত করার লক্ষ্যে নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী কাজ করা হলে অল্পদিনের মধ্যেই দাসপ্রথার চূড়ান্ত অবলুপ্তি ঘটত, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই। (Studies in Muhammadanism, p-357)

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের প্রাণবস্তু ও মৌল মর্যাদা হলো তার আজাদী, তার স্বাধীনতা। প্রত্যেকটি মানুষ সে কোনো বড় অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করুন, কোনো নিচ বংশের জাত হোক, মুসলিম হক, অমুসলিম হোক, কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ, পীতাঙ্গ, সুন্দর চেহারার হোক বা কুশ্রী— সব মানুষই মানুষ হিসেবে

এক, অভিন্ন। মর্যাদা ও অধিকারের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য বা তারতম্য ইসলামে স্বীকৃত নয়।

পক্ষান্তরে গোলামী বা দাসত্ব এক অস্থায়ী-অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম ব্যাপার। মানবতার ললাটে এক অবাঞ্ছনীয় কলংক টানা। কোনো লোক বাহ্যিক কোনো কারণে এই দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে এই কলংক চিহ্ন মানবতার ললাট হতে চিরদিনের তরে মুছে ফেলবার এবং মানুষকে প্রকৃতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন করার লক্ষ্যে যত উপায় ও পন্থা সম্ভব, ইসলাম সেসবগুলোকেই কাজে লাগাবার পক্ষপাতী। উপরে যতগুলো পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ইসলামের প্রস্তাবিত সম্ভাব্য পন্থাসমূহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।

মুক্তি লাভের পর

দুনিয়ার অপরাপর ধর্মের দৃষ্টিতে গোলাম মুক্তি লাভের পরও প্রায় গোলামই থেকে যায়। হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে যে কোনো ব্রাহ্মণ অপর যে কোনো ব্রাহ্মণের মুক্ত গোলামকে পুনরায় নিজের গোলাম বানিয়ে রাখার অধিকারী, তার কোনো কারণ থাকুক আর নাই থাকুক। কিন্তু ইসলাম গোলামী থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় গোলাম বানানোর কোনো পন্থাকে আদৌ সমর্থন করেনি। গোলামী থেকে একবার মুক্তি লাভের পর সে সম্পূর্ণরূপে ও চিরদিনের তরে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে গেল। পুনরায় তাকে গোলামী শংখলে বন্দী করার কারও অধিকার নেই। বিয়ে, তালাক, লেন-দেন, সামাজিকতা, রাষ্ট্রনীতি, কোনো একটি দিক দিয়ে কোনো একটি ক্ষেত্রেও সে আর গোলাম হবে না। ইমাম মালেক (রা) বলেছেন ঃ

مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَبَتَّ عِتْقُهُ حَتّٰى تَجُوْزَ شَهَادَتُهُ وَتَمَّ حُرْمَتُهُ وَيُثْبِتُ مِيْرَاثُهُ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ اَنْ يَّشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَايَشْتَرِطُ عَلٰى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ اَوْخِدْمَةٍ وَلَايَحْمِلُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الرِّقِ - (موطا امام مالك)

যে লোক তার গোলামকে মুক্ত করে দিল, তার এই মুক্তি নিশ্চিত ও শাশ্বত হয়ে যাবে। অতঃপর তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তার যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা অবশ্যই স্বীকৃত হবে। তার উত্তরাধিকার চালু হবে। তার পূর্ববর্তী মনিবের কোনো অধিকার থাকবে না কোনো ধন-মাল বা কাজের দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়ার। গোলামী তার ওপর নতুন করে চাপিয়ে দেয়া চলবে না।

ক্রীতদাসদের অধিকার

ক্রীতদাসদের প্রতি দুনিয়ার অন্যান্য সভ্য ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠী কিরূপ আচরণ গ্রহণ করেছিল, তা ইতিপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি। এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করুন, ইসলাম গোলামদের প্রতি কিরূপ আচরণ অবলম্বন করতে বলেছে, কার্যত করেছে এবং তাদেরকে কোন সব মানবিক অধিকারে অভিষিক্ত করেছে। জান-প্রাণের নিরাপত্তা, শরীয়তের সীমার মধ্যে কথা বলার ও চলাফেরা করার স্বাধীনতা, বিয়ে ও তালাকের ক্ষেত্রে স্বাধীন জ্ঞান ও যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জনের স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার হিসেবে ইসলাম প্রতিটি ক্রীতদাসকেও দিয়েছে।

মানুষের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ হলো মানুষের জীবন ও প্রাণ। কিন্তু অমুসলিম সভ্যগামী জাতিসমূহের দৃষ্টিতে গোলামদের জান-প্রাণের মূল্য জন্তু-জানোয়ারের জান-প্রাণের মূল্যের বিন্দুমাত্র অধিক কিছুই নয়। তাকে হত্যা করা হলে সেজন্য ফরিয়াদ করার ও বিচার চাওয়ার কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারে গোলাম ও স্বাধীন সকলেরই অভিন্ন অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারীকে যেমন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, গোলামের হত্যাকারীকেও অনুরূপ শাস্তিই দেয়া হয়— হত্যাকারী গোলাম হোক, কি স্বাধীন— কিসাস বা হত্যাকাণ্ডের যে শাস্তি কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে, তা নির্বিশেষে সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই কারণে ফিকাহবিদগণ রায় দিয়েছেন ঃ

يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ (احكام القران ج ١ص١٥٨)

স্বাধীন মুক্ত ব্যক্তি ক্রীতদাস হত্যা করলে এবং ক্রীতদাস স্বাধীন মুক্ত মানুষকে হত্যা করলে কোনোরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

খোদ নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ انْفَهُ جَدَعْنَاهُ -

যে লোক নিজের গোলামকে হত্যা করবে, আমরা তাকে হত্যা করব এবং যে লোক তার গোলামের নাক কর্তন করবে, আমরা তার নাক কাটব।

ইসলামী আদালতে কার সাক্ষ্য গ্রহণীয় কার সাক্ষ্য নয়, এটা বিশেষ গুরুত্ব সহকালে বিবেচনা করা হয়। কেননা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটি মূলতঃই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে লোক সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী, যার কথা অন্য লোকদের

কাছে গ্রহণযোগ্য আদালতে তারই সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয়ে থাকে। কারও সাক্ষ্য গ্রহণীয় হওয়াটা তার সামাজিক মান-মর্যাদা প্রকাশ ও প্রমাণ করে। রোমানদের কাছে গোলামরা সামাজিকভাবে অত্যন্ত হীন ও নিকৃষ্ট বিবেচিত হতো বলে বিচারের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় ছিল না। কিন্তু ইসলামে সাক্ষ্য গ্রহণ নীতি অত্যন্ত কঠোর হওয়া সত্ত্বেও গোলামদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয়েছে। হযরত আনাস (রা) বলেছেন ঃ

مَاعَلِمْتُ اَحَدًارَدَّ شَهَادَةَ الْعَبْدِ - (بخارى)

ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কেউ অগ্রাহ্য করেছে বলে আমার জানা নেই।

আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন ঃ

আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলের সুন্নাত, সাহাবাদের ইজমা এবং ন্যায় বিচারের মানদণ্ড সবকিছুই প্রমাণ করে যে, যেসব ব্যাপারে মুক্ত-স্বাধীন মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে সেই সব ব্যাপারেই গোলামদের সাক্ষ্যও অবশ্যই গ্রহণীয়।[১]

সাক্ষ্যের ব্যাপারের মতোই গণীমতের মাল বণ্টনেও গোলামরা স্বাধীন-মুক্ত মানুষের সাথে সমানভাবে অংশীদার হবে। কুরআন মজীদের এই পর্যায়ে যত আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে তাতে গোলাম ও স্বাধীন-মুক্ত মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

كَانَ اَبِىْ يُقَسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ (تاريخ ابن اثير ج ٢ ص ١٦٢)

আমার পিতা স্বাধীন-মুক্ত মানুষ ও গোলাম উভয়ের মধ্যে গণীমতের মাল বণ্টন করে দিতেন।

বিয়ে একটি মানবিক অধিকারের ব্যাপার। ইসলামের পূর্বে নিজেদের আয়েশ-আরাম ও সুখ-সম্ভোগের সুষ্ঠুতার জন্য দাস-দাসীদের বিয়ে করার অধিকার দেয়া হতো না। রোমান সাম্রাজ্য প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোলামরা আইনগতভাবে বিয়ে করার অধিকারী ছিল না।[২]

১. القياس فى الشرح الاسلامى - ابن تيميه

২. Incyclopedia of Religion and Ethics slovery.

কিন্তু নির্বিশেষ মানবতার একমাত্র কল্যাণকর আদর্শ ইসলামে এই অধিকার সমানভাবে সবাইকেই দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ -(النور : ٣٢)

তোমরা তোমাদের অবিবাহিত মেয়ে ও তোমাদের নেক চরিত্রবান দাস-দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা করো।

তদানীন্তন আরব সমাজে অনেক সময় লোকেরা দাস-দাসীদের বিয়ে দিত এবং কিছুদিন পর নিজেরাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। এতে তাদের দাম্পত্য জীবন বিঘ্নিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতো। নবী করীম (স) এটা জানতে পেরে ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন ঃ 'তোমরা দাস-দাসীদের বিয়ে দিয়ে নিজেরাই কেন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছ, তালাক দেয়ার অধিকার তো স্বামীর (তোমাদের নয়)।[১]

গোলাম পুরুষরা কেবল দাসী বিয়ে করবে, স্বাধীন নারী বিয়ে করতে পারবে না, এমন পার্থক্যপূর্ণ ব্যবস্থাও ইসলামে গৃহীত নয়। ইসলামী সমাজে গোলামরা উচ্চ শরীফ বংশীয় নারীকেও বিয়ে করতে পারে। স্বয়ং নবী করীম (স) স্বীয় মুক্ত গোলাম জায়দ ইবনে হারেসার কাছে নিজেরই ফুফাতো ভগ্নি জয়নব বিনতে নহশানকে বিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর পৌত্র ইমাম জয়নাল আবেদীনের জননী শাহরবানু ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর বিধবা হয়েছিলেন। ইমাম জয়নাল আবেদীন হুসাইন ইবনে আলীর গোলাম জুবাইদের নিকট তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে শরীফ স্বাধীন-মুক্ত পুরুষ ক্রীতদাসী বা মুক্ত হওয়া দাসীকেও বিয়ে করতে পারে। স্বয়ং নবী করীম (স) সাবেত ইবনে কাইয়েমের ক্রীতদাসী জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করেছেন।

রোমান সভ্যতার একটি কলংকজনক নিয়ম ছিল। কোনো গোলামের কন্যার বিয়ে হলে তার প্রথম রাত মনিবের সাথে অতিবাহিত হতো। সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন ঃ এই নির্লজ্জ ব্যবস্থার ব্যাপারে খ্রিস্টান পাদ্রীদেরও কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইসলামে এই ধরনের পাশবিক ব্যবস্থার কল্পনাও করা যায় না।

১. سنن ابن ماجه

অমুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে গোলামরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীবন বিবেচিত হতো বিধায় তারা মনিবের কোনো কাজের সমালোচনা করতে পারত না। সে সমালোচনা যত ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসম্মতই হোক না কেন। কখনও গোলাম এরূপ কাজ করে বসলে তার জীবনই সকল সুযোগ-সুবিধা হতে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যেত। কিন্তু ইসলাম প্রত্যেকটি মানুষকে যে চিন্তা, কথা বলা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছে, গোলামরা তা হতে বঞ্চিত থাকেনি। তারাও যে কোনো ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত কথা বলছে, উপদেশ দেয়ার ও যে কোনো লোকের দোষ-ত্রুটির সমালোচনার অধিকারী ছিল। ইসলামে বাকস্বাধীনতা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য। পানাহার ও পোশক-পরিচ্ছদ গ্রহণেও এই নির্বিশেষ স্বাধীনতা সব মানুষের সাথে সাথে গোলামদের জন্যও ছিল।

কুরআন মজীদে যেসব লোকের সাথে উত্তম সামাজিক আচার-আচরণ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে, গোলামরাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। নবী করীম (স) জীবনের শেষ মুহূর্তে যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে যেমন নামাযের তাগিদ ছিল, তেমনি ছিল ক্রীতদাস-দাসীদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করার এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করার নির্দেশ।

ইসলামী শিক্ষার আলোকে মুসলমানরা কখনোই মনে করেনি যে, দাস-দাসীরা সর্বক্ষণ শুধু তাদের খেদমতের কাজে নিয়োজিত থাকবে। এই কারণে সাহাবায়ে কেরাম হতে শুরু করে পরবর্তী ইসলামী সমাজে নিজেদের সন্তানদের ন্যায় তাদেরও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার করা হতো। একবার কাইসারীয়ার চার হাজার গোলাম বন্দী হয়ে এলে হযরত উমর ফারুক (রা) তাদের অনেককেই শিক্ষালয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য ভর্তি করে দিয়েছিলেন।[১]

হযরত আব্বাস (রা) তাঁর গোলাম ইকরামাকে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা দান করেছিলেন। আবু আমের সলিম একজন হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি গ্রেফতার হয়ে মদীনায় নিত হলে তাকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পাঠশালায় বসিয়ে দেয়া হয়। হযরত উসমান (রা)-এর প্রখ্যাত গোলাম ইমরানকে ক্রয় করে লেখাপড়া শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছিলেন।

গোলামদের ন্যায় দাসী-বান্দীদেরও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হতো। এজন্য তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়া হতো। নবী করীম (স) নিজে এজন্য সাহাবীগণকে বিশেষ উপদেশ দিতেন। একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

১. فتوح البلدان ص ١٤٩

তিন ব্যক্তি দু'টি বড় শুভ কর্মফল লাভ করবে। একজন সে, যে তার দাসীকে বিদ্যা শিক্ষা দেবে এবং খুব ভালোভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলবে। তাকে খুব ভালোভাবে আদব-কায়দা শিখাবে এবং পরে তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজে তাকে বিয়ে করবে .....।[১]

দুর্বল-অসহায় মানুষের ওপর জোর-জুলুম চালানো, তাদের প্রতি অত্যন্ত রূঢ়-নির্মম ব্যবহার করা শক্তিমান মানুষের প্রকৃতি। এর ব্যতিক্রম খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম মানুষের এই প্রকৃতিকে সংযত করতে চেয়েছে। বিশেষভাবে ক্রীতদাস-দাসীদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার ও নির্মম আচরণ গ্রহণ হতে বিরত থাকতে বলেছে।

একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমরা গোলামদের অপরাধ কতবার ক্ষমা করব ? প্রথম ও দ্বিতীয়বারের জিজ্ঞাসার কোনো জবাব না দিয়ে তৃতীয়বারে তিনি জবাবে বললেন ঃ

اِعْفُوْا عَنْهُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (ابوداود)

তাকে দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করবে।

কিন্তু শুধু ক্ষমা করতে থাকলে যদি কাজ নষ্ট হয়, তাহলে অপরাধ অনুযায়ী সামান্য শাস্তিও দেয়া যাবে না, ইসলাম এমন কথা বলেনি। এই কারণে গোলামদের দ্বারা কঠিন-দুঃসাধ্য কাজ করাতেও নিষেধ করা হয়েছে। হযরত সালমান ফারেসী ও হযরত উসমান (রা) তাদের গোলামদের ওপর কোনো কষ্ট কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। এই পর্যায়ে ঐতিহাসিক বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

শরীয়তের ঘোষিত অপরাধের শাস্তি স্বাধীন-মুক্ত মানুষের তুলনায় গোলামদের জন্য অর্ধেক রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যে যে অপরাধের শাস্তি স্বাধীন-মুক্ত মানুষের জন্য আশিটি দোররা, সেই সেই অপরাধে গোলামদের শাস্তি চল্লিশটি দোররা হবে। শাহ অলীউল্লাহ্‌র বিশ্লেষণ অনুযায়ী এর কারণ হলো, মানবদেরকে গোলামদের ওপর সীমাতিরিক্ত শাস্তিদান হতে বিরত রাখা।

বস্তুত ইসলামী সমাজে গোলামরাও সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। তারা দাওয়াত করলে সে দাওয়াত কবুল করা যে-কোনো মুসলমানের কর্তব্য। খোদ নবী করীম (স) তা করতেন এবং তাদের ঘরে উপস্থিত হয়ে তাদের দেয়া খাদ্যবস্তু আনন্দের সাথে গ্রহণ করতেন।

১. বুখারী।

ইসলামে নামাযের ইমামতি একটি বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার। ইসলামী সমাজে গোলামরা যেহেতু কোনোরূপ নিকৃষ্ট মর্যাদায় থাকে না, তাই তারাও নামাযে ইমামতি করার সমানভাবে অধিকারী। ইউরোপের দৃষ্টিতে ইসলামে যে গোলাম অত্যন্ত ঘৃণ্য, ইসলামী সমাজে সেই গোলামই নামাযের ইমামতি করার মতো অতীব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে এবং বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত তার পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেনি। হযরত আবু হুযাইফা (রা)-এর গোলাম সালেম নামাযে ইমামতি করতেন এবং তাঁর পেছনে প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরীন হযরত আবু বকর (রা), উমর ফারুক (রা), আবু সালমা (রা), জায়দ (রা) এবং আমের ইবনে রাবিয়া (রা) প্রমুখ মহাসম্মানিত সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন।

ইসলামী সমাজে সামষ্টিক কার্যাবলীর মধ্যে জামায়াতে নামায পড়ার স্থান সর্বোচ্চে। সেই নামাযের ইমামতি যখন গোলামরাও করতে পারে, তখন সামষ্টিক অন্যান্য যাবতীয় ক্ষেত্রেই গোলামদের নেতৃত্ব হওয়া কোনোই অসুবিধা থাকতে পারে না। হযরত উমর (রা) যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)কে কুফার বিচারপতি নিযুক্ত করেছিলেন, তখন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আম্মার ইবনে ইয়াসার কুফার নামাযের ইমাম এবং সামরিক অধ্যক্ষরূপে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

ইসলামের পূর্বেকার সমাজে গোলামরা কোনো কিছুর মালিক হতে পারত না। কিন্তু ইসলামের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামরাও ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকারী। হযরত উমর (রা) তাঁর খেলাফত আমলে যেসব বৃত্তি ও অনুদান বণ্টন করতেন, গোলামরাও তা থেকে ন্যায্য অংশ লাভ করত।

ইসলামে গোলামী গোলামদের জন্য রহমত

ইসলামী সমাজে গোলামদের যে মর্যাদা ও অধিকার দেয়া হয়েছে, সেই দৃষ্টিতে একথা বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বলা যায় যে, এই সমাজে গোলামদের সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দেখা দেয় তাদের গোলামী। তারা গোলাম থাকা অবস্থায় যে সুখ-শান্তি, মর্যাদা-অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করত, গোলামী হতে মুক্তি লাভের পর এর স্মৃতি তারা কখনোই ভুলতে পারত না। অনেক ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, গোলামী হতে মুক্তির সুযোগ আসলেও তারা সেই সুযোগ গ্রহণ করত না। আর মুক্ত করে দেয়া হলেও তারা আনন্দে উৎফুল্ল না হয়ে তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ত। আবু রাফে গোলাম ছিল। তাকে মুক্তি দেয়া হলে সে

কাঁদতে লাগল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, পূর্বে তো আমার দ্বিগুণ শুভফল প্রাপ্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে মাত্র একগুণ। প্রখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা) গোলাম থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণকে শ্রেয় মনে করতেন।[১] নবী

করীম (স) বলেছেন ঃ 'জান্নাতে সর্বপ্রথম যাবে সেই গোলাম, যে আল্লাহ্‌র এবং স্বীয় মনিবের আনুগত্য করেছে। হযরত আবু বকর (রা) বর্ণনা করেছেনঃ 'জান্নাতের দ্বারে গোলামরাই সর্বপ্রথম করাঘাত করবে। যারা আল্লাহ্‌র এবং নিজেদের অধিকার আদায় করে।'[২] হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পাবে যে, তার গোলাম তার উপরের মর্যাদায় রয়েছে। তখন সে বলবে, হে খোদা! এই লোকটি তো আমার গোলাম ছিল ? জবাবে বলা হবেঃ আমি তাকে তার আমলের শুভ ফল দিয়েছি এবং তোমাকে দিয়েছি তোমার আমলের শুভফল।'[৩]

ইসলামী সমাজে গোলামরা স্বাধীন-মুক্ত মানুষের সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। মুসলমানরা তাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততির ন্যায় তাদের দাস-দাসীদেরও উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার সুব্যবস্থা করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষালাভ ও কর্ম দক্ষতা অর্জনে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ফলে যেসব গোলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখে বা উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করে সমাজে আসত, তাদেরকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হতো। অতীতের গোলামীর কলংক তাদের সমান ও যথাযথ মর্যাদা লাভের পথে কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াত না। নেতৃত্ব ও মর্যাদা লাভের জন্য শুধু উত্তম যোগ্যতা ও নির্দিষ্ট কাজের দক্ষতারই শর্ত ছিল। এতে গোলাম ও মুক্ত মানুষের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা হতো না।

রাসূলে করীম (স) সিরিয়া অভিযানে যে বাহিনী পাঠাতে চেয়েছিলেন তার সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন হযরত উসামা (রা)কে। যদিও তখন তিনি মাত্র আঠার বছরের যুবক ক্রীতদাস ছিলেন। এই বাহিনীতে বড় বড় মহাসম্মানিত সাহাবীগণও শামিল ছিলেন। সকলেই হযরত উসামার নেতৃত্বে কাজ করেছেন। রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি অশ্বারোহী ছিলেন এবং খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রা) ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে চলছিলেন। হযরত উসামা বললেন, 'হয় আপনিও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করুন, অন্যথায় আমি নেমে পায়ে

১. الترغيب والترهيب ج২ص ২৫৫
২. مسند احمد البويعلى
৩. الترغيب والترهيب

হাঁটতে থাকব।' খলিফাতুল মুসলেমীন বললেন' ঃ না, আল্লাহ্‌র নামে শপথ! তুমি নামবে না, অশ্বারোহীই থাকবে। আমি সওয়ার হব না, পায়েই হাঁটতে থাকব।'

ইসলামী সমাজে গোলামরা যে কত অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিল, উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হতে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

বস্তুত গোলামরাই উত্তরকালে সমগ্র ইসলাম জগতের বিভিন্ন দেশের মুসলিম সমাজের নেতা ও সরদার হয়ে বসেছিল। খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে মক্কার সরদার ছিলেন আতা ইবনে আবু রিবাহ, ইয়েমেনের সরদার ছিলেন তায়ুস ইবনে কাইসান, মিসরবাসীদের সরদার ছিলেন ইয়াজীদ ইবনে হুবাইব, সিরিয়াবাসীদের সরদার ছিলেন মক্‌হুল দেমাশকী, জজীরাবাসীদের সরদার ছিলেন মাইমুন ইবনে মাহরান, হেরামবাসীদের সরদার ছিলেন দহাক ইবনে মুজাহিম, বসরার সরদার ছিলেন হাসান ইবনে আবুল হাসান, এঁরা সকলেই ছিলেন গোলাম এবং তারা আরব মুসলিমদের ওপর সরদারী ও নেতৃত্ব করতেন। এর কারণ ছিল এই যে, এরা সকলেই অতীব উন্নত চরিত্রের, নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন এবং অধিকতর দ্বীনদার লোক ছিলেন এবং এই গুণের দৌলতেই তারা এরূপ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। আর ইসলামে বংশ-জন্মের আভিজাত্যের তুলনায় চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য, খোদাভীরুতা, ধার্মিকতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের মর্যাদা অধিক ছিল। এজন্য আরব সমাজ এদের নেতৃত্ব ও সরদারী মেনে নিতে একবিন্দু কুণ্ঠাবোধ করেনি।

ইসলাম মুসলিম জনগণের মধ্যে গোলাম স্বাধীন করা ও করানো এবং তাদেরকে কোনোরূপ ঘৃণার চোখে না দেখার যে উদাত্ত প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল, এর ফলেই উত্তরকালে যে-কোনো ধনী ও সচ্ছল অবস্থার লোকই তার ধন-সম্পদের একটা বিরাট অংশ শুধু গোলাম মুক্ত করার কাজে ব্যয় করতেন এবং তাদের সাহায্য কাজেও বিনিয়োগ করতেন। দেমাশক নগরে 'ওয়াকফ জুবাদী' নামের একটি প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছিল। তা গোলামদের সাহায্য কাজে সদা তৎপর ছিল। তিউনুস ও দাম শহরেও অনুরূপ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছিল।[১] এসব ছাড়াও মুসলমানদের সব সময়ই চেষ্টা হতো কাফের গোলামের পরিবর্তে মুসলিম গোলাম গ্রহণের জন্য। এর ফলে মুসলিম গোলাম বিধর্মীদের দেশ থেকে ইসলামী দেশে এসেই স্বাধীন ও মুক্ত হয়ে যেত এবং কাফের গোলাম কাফেরদের দেশে পৌঁছে হয়ত গোলামী হতে মুক্তি পেয়ে যেত।

---

১. ماحر العالم الاسلامى- ج ৩ص - ৮-৯